রাণাদিল্

শ্রীপারাবত

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

RANADIL
By SR:PARABAT

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৭২ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

রাণাদিল্

তোমাদের শোনাতে চাই না আমার কাহিনী।

চাইলেই বা শুনবে কেন? আমি তো বাদশাহ্জাদী নই। জাহানারা, রোশেনারা, গউহারা বেগম—নিদেনপক্ষে যদি নাদিরা বেগম হয়েও জন্ম নিতাম তবে হয়ত তোমাদের অন্তরের আনাচে-কানাচে কৌতূহলের স্ফুলিংগ উঁকি দিত। মনে করতে, শুনিই না কেন ওর গোপন কথা। ওদের জীবনের ঘটনাগুলো তো আমাদের মত নিরামিষ নয়। গরম-গরম মশলা, অনেক পেস্তা বাদাম, কিস্‌মিস্ আখরোট আর আঙুর রসের নেশাধরা সংমিশ্রণ রয়েছে ওদের ঘটনায়। শুনলে বুকে কাঁপন ধরে, রক্তে আগুন ছোটে। আবার কখনো হিমের পরশ লেগে দেহ-মন বরফের মত জমে উঠতে চায়।

কিন্তু তোমাদের চাহিদা আমি কিছুতেই মেটাতে পারব না। সেই সামর্থ এতটুকুও নেই আমার। ভুলে যেওনা, তোমাদের চেয়েও অতি সাধারণ আমি। তোমাদের পরিবার পরিজন রয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়লে দুটো মিষ্টি কথা বলে কপালে হাত বুলিয়ে দেবার মানুষ আছে। মরণ হলে দুফোঁটা চোখের জল ফেলার প্রিয়জনের অভাব নেই তোমাদের।

আমার কেউ নেই। আমি একা। হয়ত ছিল কোন কালে। মনে নেই। তাদের দেখিনি কখনো। উষর মরুর যে দৃশ্য চোখের সামনে মাঝেমাঝে ভেসে ওঠে সে শুধু কল্পনা। কারণ মরুভূমি আমি কখনো দেখিনি।

গুলরুখ মাঝে মাঝে আমার হাতের কব্জী নেড়ে-চেড়ে, আঙুলগুলোতে হাত বুলিয়ে, গালের ওপর গাল রেখে বলে,—তুই নিশ্চয়ই রাজপুত। তাই না রে?

—জানিনা তো ভাই।

—কী যে বলিস। নিজের পরিচয় জানিস না?

—হ্যাঁ।

—কী?

—নর্তকী।

—ধেৎ। ও তো সবাই জানে। আমিও তাই। কিন্তু—

গুলরও আর একটু পীড়াপীড়ি করলেও করতে পারত, আমার চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম দেখে থেমে যায়।

এই পরিচয়-হীনতা আমার কত বড় দুর্বলতা সে কথা পৃথিবীর কাউকে বলে বোঝানো যায় না। বুঝতে পারে শুধু তারাই, যারা সুস্থ সবল দেহ-মন নিয়ে ধরিত্রীর বুকে বিচরণ করে অথচ জানে না তাদের উৎস কোথায়।

তাই বলছিলাম, আমি অতি সাধারণ এক নর্তকী। একজন নর্তকীর জীবনের কাহিনী কতটুকু আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে তোমাদের মনে? তবু পারত, যদি এই জীবনের গোড়াতেই সুদীর্ঘ ছেদ না পড়ত। নর্তকীর জীবনেও উত্থান পতন রয়েছে। সেই জীবনে আসে দেশের অনেক তথাকথিত মাননীয় পূজনীয় ব্যক্তির সংস্পর্শ যাদের মুখোশ-খোলা উৎকট পাশবিক চেহারা দেখে চমকে উঠতে হয়। আমি তা হতে পারিনি। তাই তোমাদের শোনাতে দ্বিধা জাগে। তোমাদের মত আমার মন প্রিয়জনদের স্নেহচ্ছায়ায় পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। কি বলতে কি বলে ফেলব ঠিক কি? যা বলতে চাইব হয়ত তা বলতে পারব না।

তার চাইতে নিজের দুঃখ মনের মধ্যে রোমন্থন করাই ভাল। বাদশাহ্ হুমায়ুনের সমাধি এখনো অনেক দূরে। আবদুল্লা আমার সংগিনী হিসাবে তোমাদের আমার শকটে রেখেছে। আমার প্রতি তোমাদের দরদ অসীম একথা আমি জানি। তোমাদের মন সরল। তোমাদের মনের সুকোমল বৃত্তিগুলো অটুট। আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই অবহেলিত জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, যা কল্পনা করিনি। মুঘল রাজধানীর প্রবল জীবনস্রোত আমার জীবনের ক্ষীণধারার সংগেও প্রতিহত হয়েছে। কখনো ভেসে গিয়েছি, কখনো রুখে দাঁড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। বড় প্রচণ্ড সেই স্রোত। কান্নায় ভেঙে পড়েছি। সজল চোখে হতাশা-ভরা হৃদয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলতে সেই অজানা অদেখা মরুপ্রান্তরের চিত্র ভেসে উঠত মানসচক্ষে। কোথায় সেই মরু?

এমনি ভাবে একদিন বসে ছিলাম রাজধানীর প্রান্ত সীমায় নিজের কুটিরে। বাইরে থেকে ওস্তাদ আমিন খাঁর সস্নেহ গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনলাম,—চঞ্চল বাঈ।

ত্রস্ত পদে উঠে গিয়ে দ্বার খুললাম। ওস্তাদজী একদণ্ড থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখেন। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বলে ওঠেন,—চোখে জল কেন? কার জন্যে দুঃখ করছ?

স্বার্থপরের মত মুখ ফসকে বার হয়ে এল,—নিজের জন্যে ওস্তাদজী।

—সেকি! তোমার চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে চঞ্চল বাঈ? আমি তো সব দিয়েছি তোমায়। লোকের কাছে তোমার পরিচয় নর্তকী। এই পরিচয় না থাকলে তোমার জীবিকা সংগ্রহ দায় হবে। কিন্তু অন্তর থেকে তুমি নিশ্চয়ই জানো, সংগীত তোমার অনুগত।

—জানি পিতাজী, আমি সৌভাগ্যবতী। কিন্তু এটাই কি সব? অতুল ধনসম্পদের অধীশ্বর হয়েও কি মানুষ দুঃখী হতে পারে না?

—পারে। নিশ্চয়ই পারে। সেসব পার্থিব ব্যাপার। কিন্তু সংগীত?

ওস্তাদজীর উদাস চোখে বেহেস্ত্-এর দীপ্তি। তাঁকে ব্যথা দিতে প্রাণ চায় না।

—মাঝে মাঝে ভুলে যাই পিতাজী। একা-একা বড় অসহায় বোধ হয়। আমি বড় একা।

এবারে ওস্তাদজী একটু গম্ভীর হন। বলেন,—হুঁ। ঠিকই বলেছ। একাকীত্ব একটা অভাব-বোধ জাগিয়ে তোলে। সেই অভাব-বোধের তাড়নায় মানুষ পাগল হয়। সে একটা কিছু পেতে চায়। কী পেতে চায়? পেতে চায় সস্তা আনন্দ কিংবা স্বর্গীয় কিছু। যে কোন একটা বেছে নাও। যেমনটি বাছবে তেমনি ফল পাবে। আমি সংগীত বেছে নিয়েছি। তুমিও তাই নাও বেটি।

কিছু বলতে পারি না। এই ফকিরের মত মানুষটাকে একজন সাধারণ মেয়ের মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলে লাভ নেই। তিনি বুঝতে পারবেন না। আমার যৌবন যে ধীরে-ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে, এই সত্যও তাঁর নজরে পড়ে না।

তবু ওস্তাদজীই আমার ইহকালের সব কিছু। কবে যে তিনি আমাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন জানি না। অতীতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে কিছুই স্মরণে আসে না। শুধু দেখি, ওস্তাদজীর সামনে বসে রয়েছি—সংগীত শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। তারপর একটু যখন বড় হলাম, নিজের গৃহে আমার নাচ শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শেষে একদিন বললেন,—এবারে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও।

—আমি?

—হ্যাঁ। তোমার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করেছি। সুন্দর একটি মেয়ে রয়েছে। গুলবদন তার নাম। তারই সংগে থাকবে তুমি। সে শিখিয়ে দেবে কি ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম আমি। ওস্তাদজীরও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

বলেছিলাম,—আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমি কিছু জানি না—কিছু চিনি না।

—সব জানবে চঞ্চল। ধীরে ধীরে সব চিনবে, সব জানবে। তুমি কি দেখছ না আমি বৃদ্ধ, আমি অসুস্থ? এখন থেকে তোমাকে তৈরী হতে হবে। উপায় থাকলে তোমাকে আমি সরিয়ে দিতাম না। তুমি আমার মেয়ের মত। দেখছ তো আমারও কেউ নেই? কখনো ছিল না কেউ।

—বাবা? মা? আপনার কেউ ছিল না?

হেসে ওঠেন ওস্তাদজী। বলেন,—সে তো সবারই থাকে পাগলী। খুব কম বয়সে আমি বাবাকে হারাই। তারপরেই মা আমায় ছেড়ে যান। মায়ের মুখ স্পষ্ট মনেই পড়ে না।

—কিন্তু আমার যে বাবা আর মা নেই।

ওস্তাদজী গম্ভীর হয়ে যান। একটি কথাও বলেন না আর।

আজও কুটিরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি গম্ভীর হয়ে। তিনি আরও বৃদ্ধ—আরও ন্যুব্জ। পরমায়ু নিঃশেষিত হয়ে আসছে প্রতিটি দিন।

সহসা ওঁর পদপ্রান্তে বসে পড়ে এতদিন পরে আবার বলি,—পিতাজী আমার বাবা মা কোথায়?

তিনি দুহাতে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন,—তাঁরা ছিলেন।

তাঁর হাত দুটো টেনে নিয়ে বলি,—কোথায়? আমাকে কোথায় পেলেন আপনি? বাবা মা কোথায় ছিলেন?

—উদয়পুরে।

—উদয়পুরে? রাজপুতানায়?

—হ্যাঁ।

—কোথায় গেলেন?

—নেই। সবাই যেখানে চলে যায়, সেখানেই গিয়েছেন তাঁরা। তবে বড় অল্প বয়সে। তুমিই তাঁদের প্রথম সন্তান।

—কী হয়েছিল তাঁদের?

—জানি না চঞ্চলবাঈ।

—আমাকে কোথায় পেলেন?

—এই আগ্রা শহরেই। একজন মুঘল সৈনিক তোমায় নিয়ে এসেছিল উদয়পুর থেকে। সে বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। বলতে চায়নি।

আমি তবে রাজপুত? আমার পিতা-মাতা ছিলেন? উদয়পুরে আমাদে

াড়ী ? মেবারের রাজধানীর নাম উদয়পুর না ? ওখানে আমাদের একটি ্টির নিশ্চয় আছে। আমার আত্মীয়-পরিজন সবাই আছে। শুধু মা নেই াার বাবা নেই।

আমি উদয়পুরে যাব। ওঁদের খুঁজে বার করব। কী সুখের জীবন হবে।

কিন্তু কে আমার মা বাবা ? তাঁদের নাম ? তাঁদের পরিচয় ? একটা স্বপ্ন-সাধ মুহূর্তের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়ে।

—পিতাজী !

নেই। পিতাজী নেই। আমার চোখের বাষ্পের অন্তরালে তিনি চলে গিয়েছেন। বুঝতে পারিনি। তবে একথা বুঝতে পারলাম, তিনিও আমার পিতা-মাতার পরিচয় জানেন না। জানলে অনেক আগেই আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শিক্ষা দিয়ে কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে দিতেন না।

এতদিনে উপলব্ধি করলাম কেন তিনি আমার নাম রেখেছেন চঞ্চল বাঈ। কেন তিনি আমাকে পিতাজী সম্বোধন করতে শিখিয়েছেন। এতদিনের রহস্য স্পষ্ট হল।

গুলরঙ মুঘল প্রাসাদে যায়। বাদশাহ্ জাহাংগীরের আমল থেকে একটি প্রথা চালু রয়েছে। সন্ধ্যার পর দেশের নাম করা সুন্দরী কুমারী ও নর্তকীর দল বাদশাহ্‌র অবসর বিনোদনের বিরাট প্রকোষ্ঠে একবার তাঁকে দর্শনের জন্য হাজির হয়। বাদশাহ্ এতে খুশী হন এবং এই সাময়িক উপস্থিতির ফলে প্রাপ্তিযোগ ঘটে।

শাহানশাহ্ শাহ্‌জাহানও এই প্রথা চালু রেখেছেন। দেশের সবারই ধারণা মুঘল বংশ চিরকাল হিন্দুস্থানে রাজত্ব করবে। সুতরাং চিরকাল চালু থাকবে এই প্রথা। অর্থাৎ দেশের সুন্দরী ও সম্ভাবনাময়ী নর্তকীদের খাওয়া-পরা সম্বন্ধে মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই।

গুলরঙ আমাকে প্রাসাদে যাবার জন্যে প্রতিদিন একবার করে অনুরোধ করে। আমি কেমন আড়ষ্ট হয়ে যাই সেকথা শুনে। কোথায় যেন বাধে। অথচ সে আমার পরম হিতৈষী। তাকে বারবার বিমুখ করতে মন আমার ব্যথায় ভরে ওঠে।

শেষে একদিন না পেরে তাকে জড়িয়ে ধরে বলি, —এভাবে তুই আমাকে আর বলিস না গুলরঙ। আমাকে কিছুদিন ভাবতে দে।

—আর কতদিন ভাববি ? সময় যে চলে যাচ্ছে। তোর গায়ের চামড়া

কী মসৃণ আর কোমল হয়ে উঠেছে দেখতে পাস না? তোর দুই গালে দিন-দিন কেমন রক্তের আভা ফুটে উঠছে। এই তো সময়। একে কাজে না লাগালে হঠাৎ একদিন দেখবি সব ফসকে গিয়েছে। তখন পথের পাশে গড়াগড়ি দিতে হবে। কেউ ফিরেও চাইবে না।

—বাদশাহ্‌র কাছে এভাবে হাজিরা দিতে হয় কেন রে?

—তা তো জানি না। এটাই নিয়ম।

—ওঁরা দেখতে চান কেন?

—ওমা! সে কথাও জানিস না? ওঁরা যে তৈমুর বংশের।

—তাতে কি হল?

—যুদ্ধ, শিকার আর মেয়ে—এই তিনটি ওঁদের রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে।

—ছি ছি।

—সে কি রে? ছি ছি বলছিস কেন? ভালই তো! আমাদের কত কদর দেখ তো?

—শুনেছি শাহানশাহ্‌ মমতাজ বেগমকে প্রাণভরে ভালবাসতেন। বহরমপুরে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, তার পর দিন থেকে শাহ্‌জাহানের মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে।

গুলরঙের মুখ ব্যথায় ভরে ওঠে। বলে,—হ্যাঁ, সত্যিই। সবাই সেকথা বলে। মুখে এতদিন পরেও কেমন বিষণ্ণ ভাব। চোখের দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা।

—তাহলে, এই সব কেন?

গুলরঙ আমার উন্মুক্ত নাভিদেশে হঠাৎ চুম্বন করে খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে থাকে। এটা ওর অভ্যাস। প্রথম-প্রথম চমকে উঠতাম।

গুলরঙ বলে,—তুই কি বোকা রে।

—কেন?

—তুই শাহানশাহ্‌কে আমাদের আশেপাশের আর পাঁচজনের মত ভাবছিস

—তিনি কি মানুষ নন?

—কখনই নন। শাহানশাহ্‌ মানুষের চেয়ে অনেক বড়—অনেক উঁচুতে মমতাজ বেগমের মৃত্যু হয়েছে, শাহানশাহ্‌ মন-মরাও বটে। কিন্তু হারেমে তাঁর বেগম, উপবেগম আর ক্রীতদাসীর সংখ্যা দু হাজারের বেশী। এ খবর রাখিস?

—দু হাজার?

—হ্যাঁ। এই সংখ্যা শুধু তাঁর নিজস্ব হারেমের। তারা সবসময় শাহানশাহ্‌র তুষ্টির জন্যে আকুল প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্‌ করে। তাই ওঁর দেহ দেহের ধার

অনুযায়ী চলে, মন চলে মনের পথে।

আমি অবাক হয়ে শুনি। এতদিন নগরীতে থেকেও আগ্রার কিল্লার জীবনধারা আমার কাছে অজানা থেকে গিয়েছে। ওস্তাদজী আমাকে শিখিয়েছেন শুধু সংগীত আর নৃত্য।

গুলরঙ বলে,—জানিস, এখন কিল্লার নাচ-গান সব বন্ধ। শাহ্‌জাহানের ভাল লাগে না কোনরকম আমোদ-প্রমোদ।

—তবে তোরা যাস কেন?

—উনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি না দিলে আমরা কিছুই পেতাম না। চলতো কি করে?

—এত মহানুভব তিনি?

—হ্যাঁ। তবে সবাই ফিস্ ফিস্ করছে এবারে বোধ হয় গুমোট কেটে যাবে।

—তার মানে?

—আবার আগের মত নাচ-গান শুরু হবে।

—কেন? মমতাজ বেগমের শোক ভুলে গিয়েছেন তিনি?

আমার কথায় গুলরঙ বেশ বিরক্ত হয়। তার চোখের দৃষ্টিতে তিরস্কার. লজ্জা পাই।

গুলরঙ বলে,—মমতাজ বেগমের শোক শাহানশাহ্ তাঁর মৃত্যুর পরেও পৃথিবী থেকে মুছে যেতে দেবেন না। ওই যমুনার একটু উজানে বিরাট প্রাসাদ তৈরী হচ্ছে জানিস না?

আমি শুনেছি। নবাব-বাদশাহ্‌দের কত রকম খেয়াল হয়। ভেবেছি সেই রকমের কিছু। ওস্তাদজী বলেন, কত লোক অমর হতে চায়। যাদের কিছুই দেবার নেই তারা বড়-বড় হর্ম্য তৈরী করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু শাহানশাহ্‌কে অত ছোট বলে ভাবতে ইচ্ছে হল না। তিনি নিজের চেয়ে মমতাজের স্মৃতিই বোধ হয় বেশী করে রক্ষা করতে চান। তাঁর হারেমে দুই হাজার রমণীর অস্তিত্বের কথা না জানলেও একথা জানতাম যে মুঘল-বাদশাহ্‌দের অনেক বেগম থাকে, শাহ্‌জাহানেরও রয়েছে। তবু শুধু মমতাজ বেগমের গর্ভে তাঁর চোদ্দটি সন্তান জন্মেছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে বেগমের প্রতি তাঁর অপরিসীম আকর্ষণ। শেষ সন্তান গউহারা বেগমের জন্মের সময় মমতাজকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয়।

গুলরঙের চোখের তিরস্কার মিলিয়ে যায়। সে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে,—বাদশাহ্‌জাদার শিগগিরই সাদি হতে চলেছে।

—কোন্ বাদশাহ্‌জাদার?

—তুই সত্যিই অদ্ভুত। কোন খবরই কি রাখার প্রয়োজন মনে করিস না?

সংকুচিত হই। গুলরঙের এই ধিক্কার অমূলক নয়। রাজধানীতে বসবাস করে এমন নির্বিকার থাকা শোভা পায় না। এখন আমি আর ওস্তাদজীর আশ্রয়ে নেই।

জড়িত কণ্ঠে বলি,—এবার থেকে রাখব। রাগ করিস না ভাই।

—তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রাগ হয়। নইলে আমার কি? এই সব খবর জানা আমাদের কর্তব্য। এর ওপর নির্ভর করছে আমাদের রুজি রোজগার।

—বাদশাহ্‌জাদা, দারাশুকোর সাদি বুঝি

—হ্যাঁ। শাহানশাহ্‌র চোখের মণি তিনি। তাঁকে বাদ দিয়ে কার সাদি হবে? তাছাড়া এই সাদি ঠিক করে গিয়েছেন স্বয়ং মমতাজ বেগম। শাহ্‌জাহান তখন দক্ষিণ ভারত অভিযানে গিয়েছিলেন।

—গুলরঙের অতি আগ্রহের ফলেই তার সংগে এইসব গল্প করতে হয়। এই গল্প করার সুযোগ পেলে সে অদ্ভুত প্রেরণা পায়। উত্তেজনায় তার মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে কোন বিশেষ বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন তার গলে পড়ে। আবার কখনো কোন খোজার দুর্ব্যবহারের কথা বলে রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে থাকে।

কিন্তু সে জানে না আমার মনে কতটা অনাগ্রহ এ-সব ব্যাপারে। শুধু সে কেন, ওস্তাদজীও জানেন না। জানলে তিনি মর্মাহত হতেন। কারণ আমার মত অভিভাবকহীন কুমারী মেয়েকে বেঁচে থাকতে হলে শাহানশাহ্‌র অনুগ্রহ-পুষ্ট হতেই হবে। এমন কেউ নেই, যে যেচে এসে এই গোত্রহীন কিশোরীর হাত ধরে বলবে,—চল আমার ঘরে। সেখানে তোমার স্থায়ী আসন।

যমুনার কালো জলের ওপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আশেপাশের বিটপশ্রেণী সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা করার জন্য নিস্পন্দ নিথর। দূরে জুমা মসজিদের আজানধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। আকাশের বুকে এক সারি বলাকা উড়ে চলে ত্রস্ত পাখায়। অনেক দূরে পাড়ি জমিয়েছিল তারা—ফিরতে বড্ড বিলম্ব হয়ে গিয়েছে।

একাকী বসে আছি জানালার পাশে। গুলরঙ ফিরবে অনেক রাতে। বাদশাহ্‌জাদার সাদির আয়োজন এগিয়ে চলেছে। শাহ্‌জাহান তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারার ওপর দারাশুকোর সাদির ভার দিয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করছে হারেমের পরিচারিকাদের প্রধানা সিতি উন-নিসা। জাহানারা বেগম ভ্রাতার

প্রতি প্রীতিবশত ইতিমধ্যেই তাঁর নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। সাদির এখনো কয়েক মাস বাকী। কিন্তু সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই কন্যাপক্ষের গৃহে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সচক্ পাঠানো হবে। সংগে যাবেন মমতাজ বেগমের বৃদ্ধা মাতা, তাঁর অপর এক কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন।

গুলরঙের কাছ থেকে কন্যার নামও জানা হয়ে গিয়েছে। নাম তাঁর করিম-উন-নিসা। দক্ষিণের নবাব সুলতান পরভীজের কন্যা। জাহানারা নাকি ভ্রাতার বেগমের নয়া নামকরণ করেছেন। আমার মনে হয়, দারা-শুকোই তাঁর পছন্দমত নামটি ভগিনীর দেওয়া বলে চালিয়েছেন। নাম রাখা হয়েছে নাদিরা বেগম।

গুলরঙ এই নামকরণে মহাখুশী। পাত্রী নাকি খুবই সুন্দরী। গুলরঙ এখন থেকেই দিন গুণছে। বারবার একই কথা বলে চলেছে কয়েকদিন ধরে। আমিও তার উৎসাহকে নিভিয়ে না দিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে চলেছি।

কিন্তু আর পারি না। হারেম—হারেম আর হারেম। এই বিশাল দেশের তুলনায় হারেমের স্থান কতটুকু? কতটুকুই বা তার গুরুত্ব? এক এক সময়ে মনে হয়, সারা দেশের রক্ত চুষে হারেম তার মনোলোভা টুকটুকে রঙ নিয়ে সকলকে প্রলুব্ধ করছে। সমস্ত ঘাম-ঝরা মানুষের দেহের চর্বি সংগ্রহ করে সেখানে রোশনাই জ্বালানো হচ্ছে। ভাবতে গেলে মাথায় আগুন জ্বলে। তাই ভাল লাগে না কিছু।

আমি মনস্থির করে ফেলি। হারেম নয়—আগ্রা নগরীর পথঘাট আর প্রান্তর হবে আমার নৃত্যের প্রাংগণ আর সুরেলা কণ্ঠের জলসাঘর। শাহানশাহ্ কিংবা বাদশাহ্জাদারা নয়, পথের ধূলিমাখা সাধারণ মানুষ হবে আমার নৃত্যের দর্শক আর সংগীতের শ্রোতা।

জানি, ওস্তাদজী খুবই মর্মাহত হবেন। তিনি চান খানদানী গৃহে আমার স্থান হোক। কারণ সেখানেই আমি পাবো প্রকৃত সমজদার এবং ক্ষুধার রুটি। সেখানে পাবো পেয়ার আর ঐশ্বর্য। কিন্তু না। বন্দিনী হতে পারব না আমি। কিছুতেই নয়।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। গুলরঙ এখনো ফিরে আসেনি। ফিরতি পথে সে রাতের খাবার সংগে করে নিয়ে আসে। তারই প্রতীক্ষায় বসে রয়েছি। অনতিদূরে যমুনার জলে ইতস্তত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর অতি ক্ষীণ রশ্মি। জেলেরা মাছ ধরছে। সারা রাত এই ভাবে ঘুরে ঘুরে ধরবে। ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসার উপায় নেই। এদের শীত নেই,

গ্রীষ্ম নেই। প্রাসাদের প্রসাদ এদের ভাগ্যে জোটে না। প্রাসাদের বাত্তি এদের মনে জাগায় না কোন বাড়তি প্রেরণা।

দরজায় করাঘাত। ছুটে যাই। গুলরঙ এসেছে। নিশ্চয়ই কোন মজার সংবাদ দেবার জন্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নইলে এত ঘন-ঘন করাঘাত কেন? এত জোরেই বা কেন?

দরজা খুলেই আঁৎকে উঠি। সভয়ে দু'পা পেছিয়ে যাই। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরিচিত বলিষ্ঠ এক পুরুষ!

পুরুষটির মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। সে দু পা এগিয়ে আসে। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

—হেঁ হেঁ, মিথ্যা বলেনি দেখছি। অপ্সরাই, অপ্সরা বাঈ।

—আপনি কে? কে আপনি?

—আমি? চিনতে তো পারবে না অপ্সরা বাঈ।

—কী চান আপনি?

—শুধু তোমাকে।

—না—

হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ে পুরুষ। প্রতিমুহূর্তে আমার ভয় এই বুঝি সে তার অতি সুদৃঢ় দুবাহু বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলল। তবু এক চুলও পেছনে সরে যেতে পারি না। পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। হিমশীতল হয়ে ওঠে সর্ব অবয়ব।

—ভয় নেই অপ্সরা বাঈ। তোমার ক্ষতি করব না। তোমায় তুলে নিয়ে পালিয়ে যাব না।

—কেন এসেছেন তবে?

—দেখতে।

—আপনি কে?

—বললাম তো, চিনতে পারবে না।

মূর্খের মত বলে উঠি,—আপনি চলে যান।

আবার তার অট্টহাসি। উঃ কী বীভৎস। হেসেই চলে সে। আর আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়।

শেষে সে হাসি থামায়। গম্ভীর হয়। ধীরে ধীরে বলে,—ব্যক্তিগত ভাবে তোমার ক্ষতি করার সাধ্য আমার নেই।

আমি নির্বাক হয়ে থাকি। শুধু পেছনে একটা অবলম্বন পেয়ে সেটি ধরে ফেলি।

—আমি খোজা অপ্সরা বাঈ।

মুহূর্তে বুকের বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যায়। নড়েচড়ে উঠি। অবশ দুই পায়ে রক্ত চলাচলও শুরু করে।

খোজা লক্ষ্য করে সব। মৃদু হেসে বলে,—তবে অন্য ভাবে ক্ষতি করতে পারি বৈকি। তোমায় তুলে নিয়ে গিয়ে হারেমে ফেললে পৃথিবীর আর কেউ কখনো ওই সুন্দর মুখখানা দেখতে পাবে না। বাদশাহ্‌জাদা সুজা কিছুদিন হল, ঠিক এই রকম একটি মুখের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

—না না, আমার সর্বনাশ করো না তুমি।

—নিশ্চয়ই না। সর্বনাশ তোমার করব না অপ্সরা বাঈ। তার আগে আমার আসল পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমি শাহানশাহ্‌র হারেমের খোজা। মতলব খাঁ আমার নাম। বাদশাহ্‌জাদা দারাশুকোর সাদির পরে তাঁর হারেমের ভার পড়বে আমার ওপর।

মতলব খাঁর কথা অন্য সময় হলে আমার মনে সামান্য কৌতূহল জাগালেও জাগাতে পারত। কিন্তু এই অবস্থায় এক চুল ঢেউ-ও জাগাতে পারল না।

—কি অপ্সরা বাঈ। শুনে আনন্দ হচ্ছে না?

—আমার না হোক, তোমার আনন্দ হবারই কথা। কতখানি উন্নতি হবে তোমার। তোমার উন্নতিতে আমি খুশী ভাই!

কিছু একটা বলতে হয় বলেই কথাটা উচ্চারণ করলাম। কিন্তু তার ফল হল অবিশ্বাস্য।

ওই অমিত বলশালী ব্যক্তিটি হঠাৎ কেঁদে উঠল। কী করব বুঝে ওঠার আগেই সে আমার একখানা হাত খপ্‌ করে চেপে ধরে বলে,—এমন কথা কেউ কখনো বলেনি বহিন। তোমার প্রাণ আছে, তাই অন্যের প্রাণের কথা এত চট্‌ করে জেনে ফেললে। তোমাকে আমি ভুলতে পারব না।

এক নিমেষে আমার মনের ত্রাস কোথায় উধাও হয়ে গেল। পরিবর্তে এক অজানা বেদনায় ভেতরটা টন্‌টন্‌ করে উঠল। বুঝলাম, মতলব খাঁর হৃদয়ের গহনে ব্যথার পাহাড় জমে রয়েছে কোথাও। ওর খোজা হবার ইতিবৃত্তের পশ্চাতে হয়ত রয়েছে কোন নিষ্করুণ কাহিনী। সখ করে নিজের জীবনের সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দেয় না কেউ। পৃথিবীতে জন্মে জ্ঞান হবার আগেই যারা খোজা হয়, তাদের মস্তিষ্ক আর বুদ্ধিবৃত্তিকে তো খোজা করে দেওয়া যায় না। সব কিছু দেখেশুনে তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করে নিজেদের স্বরূপ তারা চিনে ফেলতে পারে। তারা উপলব্ধি করে, পূর্ণ বয়স্ক এক যুবকের পক্ষে খোজা হবার চেয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া কত সহজ।

মতলবকে কবে খোজা করা হয়েছিল তারই বা ঠিক কি ?

এতক্ষণ গুলরঙের জন্যে ঘন-ঘন পথের দিকে চাইছিলাম। এবারে মতলবের হাত ধরে এনে তাকে বসতে দিই। ভেতর থেকে এক পাত্র পানীয় এনে তার হাতে দিয়ে বলি,—হারেমের মত এ-পানীয় সুস্বাদু নয়। তবু খেয়ে নাও। বহিনের দেওয়া।

সে আগ্রহ ভরে পাত্র নিয়ে বলে,—হারেমের সবচেয়ে সুস্বাদু পানীয় এর তুলনায় বিস্বাদ।

কিছুক্ষণ পরে ঠাট্টার ছলে হেসে বলি,—এবারে বলতো মতলব খাঁ, কোন্ মতলবে এসেছ। আমার বুকের ভেতরে এখনো কাঁপছে।

মতলবের হাসি এতক্ষণে খুবই মিষ্টি বলে মনে হয়। সংগে সংগে ভাবি, মানুষের নিজের মনই অপরকে বহুলাংশে সুশ্রী কিংবা কুশ্রী করে তোলে। অপরের ব্যবহারও অবশ্য এর জন্য কম দায়ী নয়।

মতলব বলে,—গুলরঙ তোমার এখানে থাকে ?

—হ্যাঁ।

—সে তোমার কথা আমাকে বলেছে।

—সে তলে-তলে আমার শত্রুতা করে তাহলে ?

—শত্রুতা ? তুমি বলছ কি অপ্সরা বাঈ ! সে তোমার মংগল চায়।

—তাহলে আমার কথা বলতে গেল কেন ?

—তোমার ভালোর জন্যে।

—হারেমে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে রাখা ভাল ?

মতলব আবার হেসে আকাশ ফাটায়। বলে,—কয়েদ করবে কেন ? বাদশাহ্‌জাদা দারাশুকোর সাদির দিনে কত জেনানার দরকার হবে। বাছাই করা নর্তকী আসবে। মেহেদী রঙে অতিথি অভ্যাগতদের আঙুল রাঙিয়ে তুলবে তারা। তুমিও তাদের মধ্যে একজন। এ কি কম সৌভাগ্য ? এই সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে আসে বহিন ? সারা হিন্দুস্থানে কয়জন নর্তকী ভাবী শাহানশাহ্‌র সাদিতে যোগ দিতে পারে বল ?

আমার কতটা আনন্দ হয়েছে, কিংবা আদৌ আনন্দ হয়েছে কিনা অনুভব করার জন্যে নীরব থাকি।

মতলব বলে ওঠে,—কী, আনন্দে কথা বন্ধ হয়ে গেল ?

স্মিত হেসে বলি,—যা বলেছ। আচ্ছা ভাই আমার নাম অপ্সরা বাঈ একথা কে বলল ?

—কে আবার বলবে ? আমিই রেখেছি। এমন অপ্সরার মত দেখতে।

—বাঃ, সুন্দর নাম রাখতে পারতো ? এই নামই থাক তবে।

মতলবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে,—এবারে তাহলে চলি।

তাকে সত্যিই উঠতে দেখে বলি,—কিন্তু আমার যে তেমন কোন পোষাক নেই।

—তার জন্যে ভাবছ ? বাদশাহ্জাদার সাদিতে যে যায়, সব কিছু ওখান থেকেই পায়। ফিরে আসার সময়ও শূন্য হাতে ফেরে না।

মতলব খাঁ বিদায় নেয়। আমি আবার ভাবতে বসি। মতলব পৃথিবীতে আমার প্রথম আত্মীয়—আমার ভাই। হয়ত তোমরা আমার কথা শুনে মুচকি হাসবে কিংবা হয়ত উচ্চকণ্ঠেই হেসে উঠবে। ঘৃণায় নাক উঁচিয়ে বলবে—ছি ছি, একে আবার আত্মীয় বলে পরিচয় দেয় কেউ ? এমন লোক আত্মীয় হলেও তো অস্বীকার করে সভ্য মানুষ।

তোমরা একথা বলতে পারো। কিন্তু আমার মত এক কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, যে যৌবনের দ্বারদেশে তার বাঁ পা স্পর্শ করছে মাত্র, তার পক্ষে এর হৃদয়ের উত্তাপ অস্বীকার করার উপায় নেই। জীবনে 'বহিন' বলে এর আগে এভাবে কেউ আমার হাত চেপে ধরেনি। আমি যে বহিন হতে পারি, এ ধারণাও আমার ছিল না। তোমরা বলবে ভাইতো নয়—অর্ধ-ভাই। আমি তা বলি না। ঈশ্বর-সৃষ্ট মানুষের বক্ষ-পিঞ্জরে আবদ্ধ যে হৃদয়, সেই হৃদয় স্ত্রী-পুরুষ খোজা কিংবা নপুংশকের সীমারেখাকে ধুয়ে মুছে দেয়। অন্ততঃ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই বলে। তোমরা আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ, প্রিয়জনের সুখের আবেষ্টনীতে মানুষ হয়ে তোমাদের মস্তিষ্ক অনেক বেশী পরিণত। তোমরা একথা বলতে পরো যে লিংগভেদে উচ্ছ্বাস প্রবণতা কিংবা হৃদ্-চাঞ্চল্য ভিন্ন ধরনের হয়। কিন্তু হৃদয়ের সেই উত্তাপ ? তারও কি প্রকার ভেদ রয়েছে ?

অবশেষে সেই পরম শুভদিন এলো। বাদশাহ্জাদা দারাশুকোর সাদি উপলক্ষ আগ্রানগরী উৎসব-মুখর হয়ে উঠল। এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল দারাশুকোর ভাবী বেগম নাদিরার গৃহে বিরাট শোভা যাত্রা সহকারে 'সচক্' প্রেরণের দিন থেকে। শোভাযাত্রার তেমন জলুস নাকি নগরীর কেউ আগে কখনো দেখেনি।

হবেই না বা কেন ? সবাই বলে শাহানশাহ্ শাহ্জাহানের মত ঐশ্বর্য অন্য কোন মুঘল বাদশাহ্র ছিল না। তাঁর সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ কম বলে অপব্যয় কিছুই নেই। ফলে কোষাগার উপ্চে উঠছে।

কিন্তু তাই কি সব? আসলে শাহ্‌জাহানের দারা-অন্ত প্রাণ। মতলব খাঁ আমাকে এই কথা জানিয়েছে। এখন আমি হারেম আর প্রাসাদ সম্বন্ধে অনেক নির্ভুল খবর পেয়ে থাকি।

মতলব বলে, দারা যদি শাহানশাহ্‌র পুত্র না হতেন, তবে তিনি তাঁর স্নেহ না পেলেও, পরিচিত সবার স্নেহ অনায়াসে লুটে নিতে পারতেন। এত সুন্দর তার স্বভাব। শুনে কেউ কৌতুক বোধ না করে পারে না। কারণ বাদশাহ্‌জাদা আর শাহ্‌জাদাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা শুনি। স্বচক্ষেও কত লোক কত কিছু দেখে। দারাশুকো কি এতই সৃষ্টিছাড়া হবেন? তাই যদি হয়, তবে তখ্‌ত্‌তাউসে উপবেশনের পরের দিনই হীন চক্রান্তের ফলে বিতাড়িত হবেন। ওস্তাদজী বলেন, সাম্রাজ্য পরিচালনায় যে নোংরামি রয়েছে, তাতে বাদশাহ্‌দের গায়ে নোংরা লাগতে বাধ্য। তাই সাধারণ সং মানুষের সংগে তাদের চরিত্রের তুলনা করা চলে না। তাদের অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়।

দারাশুকো যে শাহ্‌জাহানের নয়নের মণি, সেই কাহিনী শোনাতে গিয়ে মতলব একদিন বলে,—জান বহিন, বাদশাহ্‌ জাহাংগীরের আমলে শাহানশাহ যখন বাদশাহ্‌জাদা তখন একবার মেবার দখল করে রাণাপ্রতাপের পৌত্রকে নিয়ে বিজয়ী বীরের মত ফিরে এলেন। সে কী সম্মান, বাদশাহ্‌জাদা খুরমের তারই একমাস পরে দারাশুকোর জন্ম। তাই শাহানশাহ্‌র কাছে দারাশুকো পয়মন্ত। তাছাড়া বড় ছেলের স্বভাব যদি মধুর হয়, তবে কোন বাপের দৃষ্টি অন্য ছেলের দিকে যায়? জাহাংগীর বাদশাহ্‌ পৌত্রের নাম রাখলেন দারাশুকো। তাছাড়া আর একটি নামও দেওয়া হয় তাঁর। গুল্‌-ই-আওয়ালিন্‌-ই-গুলিস্তান-ই-শাহী।

—বাব্বাঃ, এত বড় নাম?

মতলব হেসে ওঠে। বুঝতে পারি, দারাশুকোকে সে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। এই ভালবাসার মধ্যে এক-চোখামী নেই। দারার ভেতরে নিশ্চয় কোন গুণ আছে। অন্তত অন্যান্য বাদশাহ্‌জাদাদের মত দোষের প্রাবল্য বেশী নয়।

মানুষটি সম্বন্ধে একটু কৌতূহলান্বিত হয়ে উঠি। আর সেই জন্যেই সাদির দিনে জীবনে প্রথম আগ্রার কিল্লায় গিয়ে হাজির হই গুলরুখের পেছু পেছু দুরুদুরু বুকে।

সুনির্বাচিত দিন। 'হেন্‌না বন্দী' উৎসবের দিন। জীবনে প্রথম দেওয়ান-ই-খাস দেখলাম। প্রতি পদে আড়ম্বরের আতিশয্যে বিহ্বল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ি।

গুলরঙ কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। বারবার আমাকে খুঁচিয়ে বলে,—অমন হ্যাকা হয়ে থাকিস না। দেখতে পাস না, তোর দিকে কত পুরুষের চোখ? অন্ধ নাকি?

লজ্জায় মুখ নত হয়।

—চল্। ওই যে সোনার পাত্রগুলো পরপর সাজানো রয়েছে, ওতে আছে মেহেদী রঙ। একটা দখল কর। এখুনি কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

—মতলব খাঁ কোথায়?

—সে কি এখানে আসতে পারে?

—ওই পাত্রগুলো সত্যিই সোনার তৈরী?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—চুরি হবে না?

—নাঃ, তোকে নিয়ে পারা যায় না। চুরি হলে কি এসে যায়? আর হবেই বা কি করে? নজর আছে। চল্ চল্। ওই যে আসতে সুরু করেছে সবাই।

এগিয়ে গিয়ে অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত একটি স্বর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াই।

গুলরঙ কানে কানে বলে,—তোর ওপর হিংসেয় গা জ্বলে যাচ্ছে।

—কেন রে?

—চোখের মাথা খেলি নাকি। তোকে যে গিলছে সবাই।

—যাঃ।

—খুব সাবধান। বাদশাহ্জাদা সুজার নজরে পড়লে নাচ-গান বন্ধ হয়ে যাবে। মুরাদও কম যায় না। তবে আওরঙ্গজেবের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারিস।

—দারাশুকো কোথায়?

—কেন?

—দেখতে ইচ্ছে করছে।

—সব্বনেশে ইচ্ছে তোর। অমন ইচ্ছের কথা মুখেও আনিস না। বিশেষ করে আজকের দিনে।

—কেন?

—তোকে দেখে যদি তিনি মজে যান?

—তোর মুখে কিছু আটকায় না।

গুলরঙ হাসে। আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে,—দেখতে চাস

সত্যিই ?

—হুঁ।

আমরা দেওয়ান-ই-খাসের এক পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। চারদিকে রঙ-বেরঙয়ের ঝাড়-বাতি। চিরাগদানিগুলো যেন আনন্দে মাতোয়ারা।

সামনের প্রাংগণে নানান ধরনের বাজি পুড়ছে। কালো আকাশের গায়ে সেই বাজির কত বাহার। নিজেকে নিঃশেষিত করে তারা তাদের শোভা দেখিয়ে যাচ্ছে। নর্তকীরাও বাজির মত নাকি ?

গুলরঙ এক জায়গায় থেমে যায়। বলে,—চেয়ে দেখ।

দেখি একজন সুপুরুষ তার দুখানি হাত সামনে ধরে রেখেছে। একটা অতি সূক্ষ্ম পর্দা ঝুলছে। তারই পশ্চাতে হারেমের বহু সুন্দরী রয়েছে। তাদেরই একজন তরুণটির হাত মেহেদী রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে।

কেউ না বলে দিলেও যুবকের চেহারা আর অতি মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হল না ইনিই সেই দারাশুকো। গুল-ই-আওয়ালিন্-ই-গুলিস্তান-ই-শাহী।

আমার চোখের পলক পড়ে না। ইনিই তিনি। মতলব খাঁ যাঁর কথায় পঞ্চমুখ।

গুলরঙ আমার গা টিপে বলে,—মরণ হল নাকি তোর ?

আমি তবু তরুণের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারি না। তাঁর মুখের সৌম্যভাব আমাকে বিস্মিত করে। কেমন যেন বেমানান, এই বয়সে এই পরিবেশে।

অজ্ঞাতে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাই। আমার খেয়াল নেই, গুলরঙ অনেক আগে থেমে গিয়েছে। সে আমাকে ডেকেছে। বাজি আর বাদ্যের আওয়াজে কানে যায়নি আমার। সে যখন তীব্র চীৎকার করে ওঠে তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমি চমকে পেছনে ফিরতেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনি—শোনো।

থেমে যাই। পর্দার আড়ালে শতকণ্ঠের কল-কাকলি। তাদের অনেক লাবণ্য ভরা মুখ অস্পষ্ট দেখা যায়।

বাদশাহ্‌জাদা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ান।

ঝরোখার ওপাশ থেকে কার আদেশ মিশ্রিত অনুযোগ ভেসে আসে,—দারা, আজকের দিনে অন্তত অন্যদিকে চাইতে নেই।

দারা মুখ ঘুরিয়ে বলে,—অল্প একটু সময় নেব জাহানারা।

একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে আমায় নিয়ে যান দারাশুকো। একবার

সামান্য মাথা হেলিয়ে লক্ষ্য করি গুলরঙ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে আমি চরম শাস্তি পেতে চলেছি। কিন্তু আমার আতংক অতটা নয়। এখান থেকে বিতাড়িত হলে আমার কিছু এসে যাবে না। আমার ভয় শুধু বাদশাহ্‌জাদার সম্মুখীন হতে। জীবনে কখনো এমন অবস্থায় পড়িনি।

দারাশুকো প্রশ্ন করেন,—তুমি কে?

কী পরিচয় দেব? কিছুই যে বলার নেই। আমি কি নিজেই জানি আমার পরিচয়?

—আমি সামান্যা নর্তকী বাদশাহ্‌জাদা। আমার অপরাধ হয়েছে। এমন আর হবে না। আমায় ক্ষমা করুন।

—অপরাধ? কি অপরাধ করেছ? দারাশুকোর চোখে জিজ্ঞাসা।

আমার ভরসা হয়। বলি,—ওদিকে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। আপনি বিশ্বাস করুন। আমি বুঝতে পারিনি। আজই প্রথম এসেছি। আপনি বিরক্ত হয়েছেন।

—কে বলল বিরক্ত হয়েছি? বরং আনন্দিত হয়েছি। খুব খুশী হয়েছি। অথচ হওয়া উচিত নয়। আমি খুশী।

—আমার সৌভাগ্য।

—কী জানি, কার সৌভাগ্য। তোমার রূপ আছে ঠিকই, কিন্তু সেজন্যে নয়। ঠিক বুঝতে পারছি না। না, রূপ নয়। রূপ অনেক দেখেছি।

দারাশুকোর হেঁয়ালী-ভরা কথা আমিও বুঝতে পারি না। কিন্তু মনে-মনে বুঝতে পারি, মতলব খাঁ একটুও বাড়িয়ে বলেনি। মানুষটির কণ্ঠ যেন সুধা-মাখা। চোখ দুটি কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ হদিশ মেলা ভার।

—আমি যাই?

—না। আর একটু। তোমার নাম?

—নাম? আমার নাম অপ্সরা বাঈ।

—সুন্দর নাম। সার্থক নাম। কিন্তু এখন তোমার চলে যাওয়া উচিত না হলেও, আমার যাওয়া উচিত। আচ্ছা, একটা কথা বলি।

—হুকুম করুন।

—আমি ছোট্ট একটি নাম দেব তোমায়। তুমি রাখবে?

কি করব ভেবে উঠতে পারি না। জানি, অথচ সম্মতি দিতেই হবে। কিন্তু মনের থেকে কি? হ্যাঁ, মনের থেকেই।

—রাখব বাদশাহ্‌জাদা। এ আপনার অনুগ্রহ।

— তোমার নাম দিলাম রাণা দিল্। আমি চলি। এই নামেই তুমি পরিচিত হয়ো। তাহলে আবার তোমায় খুঁজে পেতে পারি। তখন কথা হবে।

দারাশুকো চলে গেলেন। কিন্তু আমার কতখানি নিয়ে গেলেন, জানতে পারলেন না। অথচ আমি সচেতন যে, পর্দার ওই অন্তরালে কোথাও মসলিনে আবৃতা, মনি-মাণিক্যে সজ্জিতা এক অপরূপা সুন্দরী বসে রয়েছে। নাম তার করিম-উন-নিসা। নাদিরা বেগম। এই মুহূর্তে যে পুরুষ তাঁর সুমিষ্ট কথায় আমার হৃদয়ে ঝড় তুলে চলে গেলেন তাঁর সবটুকুর দাবীদার ওই নাদিরা বেগম। কিন্তু মন এমনি জিনিস — যুক্তি মানে না। অজ্ঞাতকুলশীলা এক দরিদ্র নর্তকী শুধু রূপের দৌলতে কারও মনে ক্ষণেকের দোলা দিলেও, সেই মনকে চিরতরে জয় করতে পারে না। এই যুক্তি সাধারণ পুরুষের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু মুঘল তখ্‌ত্‌তাউসের ভাবী উত্তরাধিকারীর বেলায়? আমি উন্মাদিনী নাকি?

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ইতিমধ্যে দেওয়ান-ই-খাস বিশিষ্ট অতিথিদের ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করিনি আমি।

গুলরঙ এসে সামনে দাঁড়ায়। ক্রোধে সে আগুন হয়ে উঠেছে। আমার জন্যে তার সব আনন্দই মাটি।

— কী সর্বনাশ করলি বলতো?

— কেন? কি হয়েছে?

— বাদশাহ্‌জাদা তোকে চলে যেতে বলেছেন তো?

— না তো?

গুলরঙের মুখে অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করি। সে তার স্বর্ণপাত্র একহাতে পেছনে ধরে বলে, — কি বললেন উনি?

— নাম জানতে চাইলেন।

— আর কিছু না?

— না।

— তবে তো তোর বরাত খুলল।

গুলরঙ আর দাঁড়ায় না। আমাকে টেনে নিয়ে চলে। উপস্থিত পুরুষদের আঙুলে মেহেদী রঙ মাখিয়ে দিতে হবে। আজ সবদিকে শুধু রঙ আর রঙ আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হতে থাকে।

যার কাছে যাই, সবাই দেখি আমার হাতে হাত বুলিয়ে দেয়। গালে হাত রাখে। ভাল লাগে না আমার। সবাই জানতে চায় আমার নাম। আমি বলি অপ্সরা বাঈ।

কিছুক্ষণ পরে গুলরঙ এসে বলে, — দারাশুকো তোকে ডেকে কথা বলছে

কি হবে, আর একজন হারিয়ে দিয়েছে তোকে।

— আমি কি জিততে চেয়েছি?

গুলরঙ রাগে গরগর করতে করতে বলে, —তুই না চাইলেও আমি চেয়েছি। আমার নিজের না হোক, অন্তত তোর সুখ্যাতি হবে — বড় আশা করেছিলাম।

— দুঃখ করিস না ভাই।

— কিন্তু কে সেই মেয়েটি? কতখানি রূপসী একবার দেখতে চাই। সবাই মন্ত্রের মত বারবার তার নাম আউড়ে চলেছে?

—কী নাম?

—অপ্সরা বাঈ।

প্রচণ্ড ধাক্কা খাই, কথা বলতে পারি না।

গুলরঙ চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বলি; — মেয়েটাকে শুধু শুধু খুঁজে কি হবে ভাই?

— আলবৎ খুঁজব।

— আমার একটা অনুরোধও কি রাখতে নেই?

— কেন? তার ওপর তোর এত মমতা কিসের?

— না। এতটুকুও মমতা নেই। বরং পারলে অপ্সরা বাঈ-এর নাম মুছে দিতাম।

— এতদূর? তোরও হিংসে বলে পদার্থ আছে তাহলে? চোখ ফুটেছে একদিনেই?

— হিংসে নয়। রাগ।

গুলরঙ হেসে বলে, — ওই একই কথা। চল্ দুজনা মিলে তাকে খুঁজে বার করি।

— তাকে পাবি না গুলরঙ।

— তার মানে? তাকে তুই চিনিস? সে চলে গিয়েছে? কোন্ বাদশাহ্জাদা তাকে সবার অলক্ষ্যে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন?

আমি কেঁপে উঠি। বলি, — না। সে রয়েছে। আমিই সেই হতভাগিনী।

গুলরঙ বোবা হয়ে যায়। সে কোনরকমে বলে, — তুই অপ্সরা বাঈ? কবে থকে? কে দিল এ নাম?

— মতলব খাঁ প্রথম যেদিন আমাদের ওখানে গিয়েছিল, এই নামে ডকেছিল। আজ সবাই নাম জানতে চাইলে, ওই নাম বলে দিয়েছি। পরে আর খুঁজে পাবে না কেউ।

— খুঁজে পাবে না? তুই বোকা। সবাই যখন নিজেকে সামনে এগিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত তুই কেন নিজেকে সরিয়ে নিতে চাস? না,- চলবে না। আমি এখনি বলে দিচ্ছি।

— গুলরঙ' এভাবে আমার ক্ষতি করিস না।

সহসা শত কলকণ্ঠ, বাদ্যি-বাজনা নিমেষে স্তব্ধ হয়ে যায় অদৃশ্য কোন্ শক্তির সংকেতে। যে যেখানে ছিল সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়।

শাহানশাহ্ শাহ্জাহান এগিয়ে আসছেন।

হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাই। সুদীর্ঘ পুরুষ। তাঁর দুপাশে দেহরক্ষী এবং আরও অনেকে। গুলরঙ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে, — খুব ফর্সা দেখছিস যাঁকে, উনি আওরঙজেব। তাঁর এপাশে সুজা। সাবধান।

আমি আওরঙজেবকে দেখে মুহূর্তের জন্য চোখ ফেরাতে পারি না। ছিপ্-ছিপে চাবুকের মত দেহের গঠন। মুখে কোন রেখা নেই। অথচ চোখ দুটি বুদ্ধি-দীপ্ত।

শাহানশাহ্‌র মাথার চুল সাদা কিনা বুঝতে পারি না। কারণ তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছে বাদশাহী তাজ।

শাহানশাহ্ এগিয়ে এসে তাঁর বহুমূল্য আসনে উপবেশন করেন। দারাশুকো অভিবাদন জানাতে-জানাতে ধীরে-ধীরে শাহানশাহ্‌র পাশে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ান। সবার দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ। সবারই মুখে স্মিত হাসি। শুধু আওরঙজেব গম্ভীর — বহিঃপ্রকাশ নেই কোন। আশ্চর্য এই তরুণ। কেন যেন আমার মনে হল, এত আনন্দ, এত আড়ম্বর তরুণটি একেবারে পছন্দ করছে না। অথচ অসাধারণ সংযত ভংগিতে সে তার যথাকর্তব্য করে চলেছে। সবচেয়ে সুপুরুষ যে সুজা, তার মধ্যেও একটা চাঞ্চল্য অনুভব করা যায়। প্রতিটি সুন্দরীর পেছু পেছু তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার শাহানশাহ্ তাকে কিছু বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক দেখে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেন। তবু সুজার খেয়াল নেই। এক সময় তার দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে আমার ওপর পড়েই স্থির হয়ে যায়। আমি ওড়নায় মুখ ঢাকি।

দারাশুকো শাহ্জাহানের পদতলে নতজানু হয়ে বসে গম্ভীর এবং স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, — শাহানশাহ্, আল্লার মেহেরবানী, আপনার স্নেহচ্ছায়ায় ভগিনী জাহানারার সাহচর্যে এবং আমার পরলোকগত মায়ের ইচ্ছায় আজ নতুন জীবনে প্রবেশ করলাম। এই সন্ধিক্ষণে আমি খোদাতায়লার নামে শপথ করে বলছি, যদি দীর্ঘজীবী হই, তাহলে আপনার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত— আপনার অনুগত থাকব। আপনার ইচ্ছাই হবে আমার ইচ্ছা। কোর-আন্ শরিফ

ছাড়া আপনার আজ্ঞার মত মূল্যবান আমার কাছে কিছুই থাকবে না।

দারাশুকো ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ান। চারদিকে মৃদু সাধুবাদ গুঞ্জরিত হতে থাকে। শাহানশাহ্‌র মধ্যে একটা ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নয়নদ্বয় কি সামান্য বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে? নিজের বহুমূল্য আস্তিন দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন কেন?

কিন্তু তাঁর ঠিক পাশে এ কি দেখছি! আওরঙজেবের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছে না? ঠিক স্বাভাবিক নয়। অত্যন্ত মৃদু অথচ বিদ্রূপাত্মক। ভালভাবে লক্ষ্য না করলে কেউ বুঝতে পারবে না যে সে হাসছে। আমি বুঝতে পারি। শৈশব থেকে পরের আশ্রয়ে মানুষ হয়ে পরের মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে তাদের মুখের রেখাকেই ভাষা বলে জানতে শিখেছি।

শাহানশাহ্‌ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আলিংগন করেন। তারপর একটি মুক্তোর মালা স্বহস্তে তাঁর গলায় পরিয়ে দেন। এরপর তিনি মাথার পরিয়ে দেন একটি শেহ্‌রা।

শান্ত কণ্ঠে বলেন, — এই একই শেহ্‌রা, ঠিক এমনভাবে আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন বাদশাহ্‌ জাহাংগীর একদিন। সেদিন তোমাদের মা মমতাজ বেগমের সংগে আমার সাদি হয়েছিল।

সমস্ত দেওয়ান-ই-খাস আনন্দে ফেটে পড়তে চায়। শাহ্‌জাহানের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এই প্রথম হাসি। মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর মুখে এর আগে কেউ হাসি দেখেনি। সবাই সেই কথা বলাবলি করে।

গুলরঙকে অন্যান্য সব নর্তকীদের সংগে কী যেন আলোচনা করতে দেখলাম। ওদের আলোচ্য বিষয় একটু কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে শুনতে পেলাম। ওদের আকাঙ্খিত প্রতীক্ষা, কোন্ সময়ে শাহানশাহ্‌ কিল্লায় আবার নাচ-গান চালু করার অনুমতি দেবেন। নর্তকীদের নূপুরের আওয়াজ এখানে প্রতিদিনই শোনা যায়। এই আওয়াজে এক ধরনের ছন্দও রয়েছে। কারণ পায়ে নূপুর বাঁধলে নর্তকীদের গতি ছন্দময় হতে বাধ্য। কিন্তু সেই আওয়াজে উদ্দামতা নেই। সংগীতের আসর বসে না আর। বড় বড় ওস্তাদেরা নর্তকীদের মতই একবার শুধু হাজিরা দিযে প্রাপ্য নিয়ে চলে যান।

গুঞ্জনধ্বনি থেমে যায়। শাহানশাহ্‌ কিছু বলতে চান। সবাই উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

শাহ্‌জাহান বলেন, — আমাদের মুঘলবংশে একটা অপ্রীতিকর জিনিস দু-এক পুরুষ ধরে চলে আসছে। আমার ইচ্ছা তা যেন আর না হয়। কোন বাদশাহ্‌র মৃত্যুর আগে থেকেই তখ্‌ত্‌তাউস নিয়ে অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ আর খুন-জখম

সুরু হয়। জানিনা খোদাতায়লা কী উদ্দেশ্য সাধন করেন এর দ্বারা। এই অশান্তিময় সময় আমাকেও পার হতে হয়েছে। পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে তেলেংগানা, পাটনা, বিহারের পথে-প্রান্তরে। সংগে ছিলেন মমতাজ বেগম এবং আমার ছেলেমেয়েরা। এদের এখনো সেই ভয়ংকর দিনগুলির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। সেই বিভীষিকাময় দিনগুলিতে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল ছিল মমতাজ বেগমের অপার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং তাঁর মুখের মিষ্টি হাসি।

শাহানশাহ্ এবারে কোনরকম সংকোচ না করেই চোখদুটো মুছে নেন। পুত্রদের দিকে প্রশ্ন করেন, — তোমরা কি স্বীকার কর না একথা?

সবাই দৃঢ়ভাবে ঘাড় হেলিয়ে স্বীকার করে। ঝরোখার দিকেও একবার চাইলেন শাহ্জাহান। কারণ সেখানে রয়েছে তাঁর কন্যাগণ। সবই বুঝল, তারাও সমর্থন করে একথা। শুধু তারা কেন, শাহানশাহ্‌র এই দুর্দিনের কথা সবার জানা। নূরজাহানের চক্রান্ত আর ক্রোধ তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ভারতভূমির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। শেষে নাকি জাহাংগীরের কাছে স্পষ্ট ভাবে সবকিছু বলে আত্মসমর্পণ করেন তিনি।

'জাহাংগীরের পিতৃহৃদয় সহজেই গলেছিল। কিন্তু নূরজাহান ছিলেন ইস্পাতকঠিন। শাহ্জাহান আজ কিছুতেই হিন্দুস্থানের শাহানশাহ্ হতে পারতেন না, যদি না বাদশাহ্ জাহাংগীরের অত আকস্মিক মৃত্যু হত। নূরজাহান তাঁর চক্রান্তজাল শেষ পর্যন্ত টেনে ডাঙ্গায় ওঠাবার অবকাশ পেলেন না। তার আগেই শাহ্জাহান নিজেকে দিল্লীশ্বর বলে ঘোষণা করে সেই জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেছিলেন।

দেওয়ান-ই-খাসে একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে। শাহানশাহ্‌র বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। দারা ও সুজা, আওরঙজেব ও মুরাদ সবাই দণ্ডায়মান।

শাহানশাহ্ একটু চেয়ে থাকেন সামনের দিকে, তারপর আমীরদের প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি ফেলেন। শেষে বলেন, — আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা আজই ভবিষ্যতের বাদশাহ্ মোটামুটি নির্বাচিত হয়ে যাক। এবার থেকে একটা প্রচলিত নিয়ম হোক, জ্যেষ্ঠ পুত্রই হবে তখ্‌ত্‌তাউসের উত্তরাধিকারী — যদি না সে উন্মাদ অথবা অক্ষম হয়। যদি না তার অকালমৃত্যু ঘটে। দারাশুকো আমার উত্তরাধিকারী।

মুরাদ ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে যায়। সুজা দারার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে। আর আওরঙজেব? তার চোখে মুহূর্তের জন্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

সে ধীরে ধীরে বলে, — একটা সর্ত অন্তত থাকা উচিত শাহানশাহ্।

শাহ্‌জাহানের মুখে বিতৃষ্ণার রেখা ফুটে ওঠে। তাই দেখে কয়েকজন অতি-উৎসাহী আমীরের খরসান্ ঝন্ ঝন্ করে ওঠে।

আওরঙজেব ফিঁকে হাসি হেসে তাদের দিকে চেয়ে বলে, — আপনাদের এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে এতটা উত্তেজিত হওয়া শোভা পায় না। দেশের মংগলের কথা ভেবেই আমি বলেছি।

শাহ্‌জাহান বলেন, — কী তোমার বক্তব্য স্পষ্ট বল।

আওরঙজেব ধীরে ধীরে বলে, — কিছুদিন ধরে আমার মনে একটা উৎসাহ-ভাব দেখা দিয়েছে। আমি লক্ষ্য করছি এখানে নাচ-গানের কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে না। খুবই সুখের কথা। ইসলাম ধর্ম ব্যভিচার শেখায় না। নাচ-গানকে গালভরা শব্দ 'শিল্প' বলে চালানো হলেও সমস্ত ব্যভিচারের উৎসস্থল এটি।

শাহানশাহ্ হাত উঁচিয়ে বলেন, — থামো। ঢের হয়েছে। ধর্মকে নিখুঁত ভাবে পালন করতে হলে মনের ভেতরের জঞ্জালগুলো সব চাইতে আগে পুড়িয়ে সাফ করে দিতে হয়। তুমি কাজী মহম্মদ জালালের চেলা হয়েছ দেখছি। বাইরের আচরণকে বড় করে তুলতে চাও।

— তারও প্রয়োজন আছে।

— সবার ক্ষেত্রে নয়। আমি এ-নিয়ে তোমার সংগে কথা বলতে ইচ্ছুক নই। কারণ আজ থেকে আমি আবার নাচ-গানের আসর বসার অনুমতি দেব ঠিক করেই এসেছি এবং তাই দিলাম।

শাহ্‌জাহানের এই ঘোষণার সংগে-সংগে দেওয়ান-ই-খাস এবং সমস্ত প্রাংগণে আনন্দ প্রবাহ বয়ে যায়। বহুদিনের রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

আওরঙজেবের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। সে বলে, — কিন্তু সম্প্রতি দারাশুকো যে রকম দ্রুত দার্শনিক হয়ে উঠেছে, তাতে ভয় হয় এই দেশ তার হাতে কতটা নিরাপদ থাকবে। কারণ জানি, দার্শনিকরা বাস্তব জগৎকে সব সময় এড়িয়ে চলে। কল্পনার জগতই তাদের কাছে সত্যি হয়ে ওঠে।

— দারাকে অত ছোট নজরে দেখোনা আওরঙজেব। ও মোল্লা আবদুল লতিফ্ সুলতানপুরীর মত বিজ্ঞ ব্যক্তির অধীনে জ্ঞানচর্চা করেছে।

আওরঙজেব সহসা চুপ করে যায়। সে বুঝতে পারে, এই আবহাওয়ায় তিক্ততা সৃষ্টি করা আর উচিত হবে না।

কিন্তু তিক্ততা যেটুকু সৃষ্টি হবার ইতিমধ্যেই হয়েছে। ফলে শাহ্‌জাহান গাত্রোত্থান করেন। তবে যাবার আগে আর একবার বলে যান, — আজ থেকে নর্তকীরা নাচবে, গায়কেরা গাইবে।

আবার আতসবাজী পুড়তে সুরু করে। আকাশে বিচিত্র রঙের নব-নব বাহার ফুটে ওঠে।

চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নর্তকী ও কুমারীরা অভ্যাগতদের মধ্যে সুদৃশ্য রুমাল বিতরণ সুরু করে। তারপর দারাশুকো তখ্‌ত্‌তাউসের পাশে রক্ষিত একটি সুন্দর পেটিকার ডালা উন্মোচন করেন। সেই পেটিকা থেকে অপূর্ব 'কোমর বন্দ্‌' বার করে প্রত্যেককে একটি করে উপহার দেন।

এই সময়ে বেশ একটা চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। কারণ এই 'কোমর বন্দ্‌' ব্যবহারে আভিজাত্য রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, বাদশাহ্‌জাদার সাদিতে নিমন্ত্রিত হবার যোগ্যতা সেই ব্যক্তির আছে।

দারার ইংগিতে নর্তকীরা গিয়ে জড়ো হয় নাচঘরে। গুলরঙ আমাকেও টেনে নিয়ে চলে। তার কত দিনের স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপ নেবে। সে আজ প্রথম কিল্লার নাচঘরে নাচবে।

বহুদিন পর নূপুরের ঝংকারে নাচঘর মুখরিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আমিও স্থির থাকতে পারি না। রক্তের মধ্যে যে রয়েছে আমার নৃত্য। স্থির থাকব কতক্ষণ?

অদূরে বাদশাহ্‌জাদারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লক্ষ্য করি দারা এবং সুজার দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ। বিব্রত বোধ করি। অতি কৌশলে নৃত্যের তালে-তালে নিজেকে সরিয়ে নিই নর্তকীদের ভীড় থেকে। এবারে আমাকে পালাতে হবে। কারণ দারার মুগ্ধ দৃষ্টির পাশে সুজার চাহনি অত্যন্ত বেমানান বলে মনে হয়। ওর দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত একটা অদম্য ক্ষুধার জ্বালা আমার শরীরকে বিষিয়ে দিতে চাইছে।

নাচঘর থেকে বার হয়ে দ্রুতপদে দেওয়ান-ই-খাসের থামের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হই। আর কিছুটা এগিয়ে যেতে পারলেই বুলন্দ্‌-দরওয়াজা। তারপরেই রাস্তা — অবাধ স্বাধীনতা।

সহসা দেখি সামনে সুজা দাঁড়িয়ে। সর্বশরীর একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। সুজা সম্বন্ধে মতলব খাঁর মন্তব্য মনে পড়ে যায়। গুলরঙের কথাও কানের মধ্যে বাজতে থাকে।

— ভয় পেয়েছ? আমার চেহারা কি এতই খারাপ?

— না।

— তবে পালাচ্ছ কেন?

— আমি অসুস্থ বাদশাহ্‌জাদা। আমাকে যেতে দিন।

— শরীর থাকলে এ-সব আপদ আছেই। তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও আছে।

নইলে পৃথিবী এত সুন্দর হয়ে উঠত না। আমি হাকিম্-ই-বুজুরগ্‌কে এখনি খবর পাঠাচ্ছি। এসো।

সুজা আমার ঠাণ্ডা হাত চেপে ধরে।

— অনুগ্রহ করে আমাকে ছেড়ে দিন বাদশাহ্‌জাদা। আমি বিশ্রাম পেলেই সুস্থ হব।

— বেশ চল আমার সংগে। বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি।

— আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, কতটা অসুস্থ আমি।

স্থানটি নির্জন। নির্জন না হলেও আমাকে উদ্ধার করার হিম্মত কারও হত না। আমার কাছে একদলা আফিম থাকলে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

সুজা তার মূল্যবান পোষাকের একদিক থেকে একটি রুমাল বার করে আমার নাকের সামনে দোলাতে থাকে। সে বলে, — এই গুলাবের সুবাসে তোমার অসুস্থতা কমে যাবে।

সত্যই অপূর্ব গন্ধ। প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, সাধারণ অসুস্থতা এতে কেটে যায়।

— কেমন মনে হচ্ছে?

— ভাল নয়।

রুমালটা একপাশে গুঁজে রেখে সে আর একটি রুমাল বার করে দোলাতে থাকে।

— এবারে বাঙলা দেশের যুঁই ফুলের সুবাস। অপূর্ব।

অস্বীকার করি না। কিন্তু সুজা কি করে বুঝবে আমার অসুস্থতার কারণ? সে একটির পর একটি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত রুমাল বার করে আমার মুখের সামনে দোলাতে থাকে। আমি যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। মনে হয় এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখছি। আমার শরীর আর মন অবশ হয়ে যায়। একটা শান্তি নেমে আসে স্বর্গরাজ্য থেকে। নিজের ইচ্ছা শক্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সুজা চাইলে আমি তার হারেমে গিয়ে ঢুকতে পারি।

— তোমার নাম কি?

— অপ্সরা বাঈ।

— অপূর্ব। সত্যই অপ্সরা। তোমাকে দেখে আমি পাগল হয়েছি। চল অপ্সরা।

দুপা এগিয়ে যেতেই ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, — এ কি করছিস্ হতভাগী? মৃত্যুর ফাঁস স্বেচ্ছায় নিজের গলায় পরছিস?

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা হিসাবে নিজেকে ভূতলে গড়িয়ে দিই।

সুজা চমকে যায়। সে আমার দেহের দিকে ক্ষণেকের জন্য চেয়ে থাকে তারপর বলে, —আমি এক্ষুনি আসছি। অন্তত হাকিম-ই-ফজ্‌লকে ডেকে আনি। তুমি নড়াচড়া করো না অপ্সরা।

সে স্থানত্যাগ করতে আমি চট্‌পট্‌ উঠে বসে তাড়াতাড়ি পায়ের নূপুর খুলে ফেলি। এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখি আশেপাশে আমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত কেউ নেই। প্রহরী যারা রয়েছে, তারা নিয়মমাফিক পাহারা দিচ্ছে। আমি দ্রুত অথচ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকি। প্রধান ফটকের কাছে ওরা আমায় তেমন ভাবে জেরা করল না। আজকের দিনে সম্ভবও নয়।

কিল্লার বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। কারণ সুজার নির্দেশে আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বার করার লোকের অভাব হবে না। আমি ছুটতে থাকি। রাজপথ দিয়ে না গিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলি।

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে শয্যার ওপর লুটিয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় হৃদপিণ্ড এখনি বন্ধ হয়ে যাবে।

অবশেষে মনস্থির করে ফেলি। ওস্তাদজী আমার পিতৃতুল্য। বলতে গেলে, পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তিনি আমাকে মানুষ করেছেন। সাধ্যমত উজাড় করে দিয়েছেন সবকিছু আমাকে। কিন্তু সর্বহারা হবার পর যে-পথ আমাকে একদিন টেনে নিয়েছিল, সেই পথের প্রতি দুর্নিবার কৃতজ্ঞতাবোধ আমাকে নাড়া দিতে থাকে অবিরত। ঋণ-শোধ করতেই হবে।

পথের আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত বাইরে টেনে আনল আমাকে। হারেমের অগাধ ঐশ্বর্য ক্ষীণতম মোহজাল বিস্তার করতে পারল না আমার মনে।

আমি হলাম পথের নর্তকী।

আমার পায়ের উজ্জ্বল নূপুর ধূলিমলিন হয়। আমার ছায়া প্রাসাদের প্রস্তর নির্মিত মসৃণ মেঝেতে প্রতিবিম্বিত না হয়ে পথের ওপর ভেসে ওঠে। আমার চতুর্দিকের আবহাওয়া সুরা আর বসরার আতরের সুবাসে আমোদিত হয় না। ঘামে-ভেজা এক অক্লান্ত জীবনের গন্ধ আমাকে প্রেরণা দেয়। আমার কপাল বেয়ে যে স্বেদবিন্দু গড়িয়ে পড়ে তাতে মিশে থাকে রঙিন ধূলিকণা।

মুক্ত বিহংগ আমি। পথের মানুষ ঘিরে থাকে আমাকে। তারা অন্তরের সংগে তারিফ করে আমার নাচকে, আমার সংগীতকে। কোমরে গোঁজা স্বল্প পুঁজি থেকে অকৃত্রিম হৃদয়ে তারা আমার দিকে ছুঁড়ে দেয় কিছু। তাদের

চোখে সুজার মত লোভাতুর দৃষ্টি নেই। তাদের অন্তরে ওমরাহ্‌র কুটিলতা নেই। তারা আমার গানের তালে-তালে আপন-আপন দুঃখ-দুর্দশা ভুলে গিয়ে নৃত্য শুরু করে। সেই নৃত্য দেখে যে প্রেরণা পাই, কিল্লার শত-সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়েও সেটি সম্ভব নয়।

কখনো বা আমি দুঃখের গান গাই। বিশেষ করে, প্রেমিক বিদেশে কিংবা যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে বিদায় নেবার সময় প্রেমিকার মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেই অব্যক্ত বেদনার কথা গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলি। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি, পুরুষেরা তাদের বিরহে প্রেমিকার মনের যাতনার কথা শুনতে ভালবাসে। কিংবা যদি কখনো রমণীদের ভীড়ে গাইবার সুযোগ হয়, তখন প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানে প্রেমিকের অন্তরের তীব্র জ্বালার কথা উজাড় করে দিই। এতে মেয়েরা খুব তৃপ্তি পায়। তারা বড় অসহায়। ক্ষণেকের তরেও যদি তারা অনুভব করে তাদের জন্য পুরুষেরা কতখানি কাতর হয়, তাদের প্রাধান্যও পুরুষের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তাদের পরিতৃপ্তির সীমা থাকে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের যে আর কিছুই সম্বল নেই।

পথের মানুষের কাছে আমার পরিচয় রাণাদিল্। নর্তকী রাণাদিল্।

গুলরঙ আমার ওপর বেজায় চটেছে। সে কল্পনা করেনি আমার মত রূপসী আগ্রার প্রখর সূর্য কিরণে গায়ের চাঁপা-রঙ দগ্ধ করার জন্যে ঝাঁপ দেবে। সে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছে, ক্রোধ প্রকাশ করেছে। শেষে একদিন আমার অজ্ঞাতে তার জিনিসপত্র সমেত বিদায় নিয়েছে। সে এখন কিল্লার উঠতি নর্তকী। অপ্সরা বাঈ-এর অনুপস্থিতিতে বাদশাহ্‌জাদা সুজার দৃষ্টি এখন তার প্রতি।

আমি একা। মতলব খাঁ ছাড়া আমার ডেরায় আসে না কেউ। ওস্তাদজীও নয়। তিনি অবশ্য এখন অসুস্থ। কিন্তু অসুস্থ হবার আগেই আমার এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। গুলরঙ তাঁকে অনেক কিছু বলে মন ভাঙিয়ে দিয়েছে। পীড়িত হবার সংবাদে তাঁকে দেখতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। দেখা করতে অস্বীকার করেছেন তিনি। বলেছেন জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন আমার মুখ-দর্শন না করেও বাঁচতে পারবেন।

আমি কেঁদেছি। আকুল হয়ে কেঁদেছি — বৃন্তচ্যুত ফুলের মত। তবু তাঁর অভীপ্সা অনুযায়ী নিজের জীবন-ধারাকে বদলে নিতে পারিনি। তাই ওস্তাদ-জীকেও আমি বর্জন করলাম। একাই চলব এবার থেকে। যে দুজনার সংগে স্নেহের যোগসূত্র ছিল তারা যখন আমাকে উপেক্ষা করেছে আমিই বা তাদের

জন্যে কেঁদে কেঁদে মরব কেন? গুলরঙ আমার কে? ওস্তাদজীই বা কে? ঈশ্বর আমাকে নিঃসংগিনী হবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। নইলে জ্ঞান হবার আগেই পিতৃ-মাতৃহীন হব কেন?

পরের মানুষ আমার আপনজন। যেদিন থেকে আগ্রার পথে-ঘাটে নর্তকী রাণাদিলের পায়ের নূপুর ঝংকৃত হতে-হতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে, সেদিন একটা তীব্র অভাব-বোধ এদের পীড়া দেবে। যদি এরা শোনে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ওদের মধ্যে অন্ততঃ দু-পাঁচজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছুটে আসবে আমার কুশল জানতে। এদের মধ্যে এমন কি একজনও থাকবে না, যে আমার রোগতপ্ত দেহকে সেবা দ্বারা নিরাময় করে তুলতে চাইবে? হয়ত না। কারণ এতটা সময় এদের কারও নেই। প্রতিটি পল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এদের দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। নিজেদের প্রিয়জনের আরোগ্যলাভের সুবন্দোবস্তও এরা করে উঠতে পারে না। পরিচয়হীন নর্তকীর সেবা করার দুঃসাহস এরা পাবে কোথায়?

কিন্তু যদি দেখে রাণাদিল্ তার কুটিরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে? তাহলে হয়ত শেষকৃত্য করার একটা ব্যবস্থা করবে। চোখের জল না ফেললেও দুঃখ পাবে। চোখের জল ফেলার মত বিলাসিতায় গা ভাসানোর মত সময় নেই তাদের। কিন্তু সেটুকুই বা কম কি? এই সামান্য ভাগ্য সম্বল করেই বা কয়জন জন্মগ্রহণ করে? শুনেছি বাদশাহ্ জাহাংগীরের মৃত্যু সংবাদে খুশীর বান ডেকেছিল। শুধু তখনকার পরাক্রান্ত বেগম নূরজাহান অনুশোচনায় ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলেন। বাদশাহ্ জাহাংগীরের মৃত্যু ঘটেছিল এত আকস্মিকভাবে যে তিনি তাঁর চক্রান্ত মাফিক আয়োজন সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেননি। ফলে মৃত বাদশাহ্কে মনে-মনে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন কি এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মরণের জন্যে?

শাহানশাহ্ শাহ্জাহানের উৎফুল্ল হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তবে হারেমের অসংখ্য বেগম এবং ক্রীতদাসীদের কেউ-কেউ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভেবে চোখের জল ফেলেছিল। সেই অশ্রু বাদশাহ্র জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থের জন্য। কারণ মতলব খাঁ গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিল এই রকমের কোন ঘটনা ঘটলে ওই সব বেগমেরা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তারা ভাবতে শুরু করে এবারে হয়ত তাদের বহিষ্কার করা হবে হারেম থেকে। তারা পিতা পুত্র ছোটো ভাই বড় ভাইয়ের বাছবিচার করে না। তারা চায় বেগম হয়ে শুধু হারেমে থাকতে। হারেমে সবকিছুর মধ্যেও খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা আছে। বাদশাহ্র প্রসন্ন দৃষ্টির শিকার বছরে একবার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই বাদশাহ্ যেই হোন

না কেন, শুধু গর্ভের সন্তান না হলেই হল।

তাই বাদশাহ্ হলেও মৃত্যুর সময় একফোঁটা ভালবাসার অশ্রুজল লাভ করা অত সহজ কথা নয়। সেই ভাগ্য হাজারে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ।

যমুনা তীরে একটি ছোট মেলা বসেছে। এই মেলার কোন ধারাবাহিকতা নেই। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ্যে এ-ধরনের মেলা আগ্রা নগরীর যত্রতত্র যখন-তখন বসে থাকে। ভীড়ও বড় কম হয় না। কারণ দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসে। নবাব-বাদশাহ্ রাজা-উজিরের সমাগম যে সব মেলায় হয়, সেখানে দরিদ্র মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যদিও বা প্রবেশের অধিকার মেলে, ক্রয় করার ক্ষমতা থাকে না ওসব জিনিস। শুধু চোখের সুখ। কারণ ওসব বহুমূল্যবান সামগ্রী তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে স্বপ্নের জিনিস।

কিন্তু যমুনার তীরের এই মেলার মত মেলায় থাকে সাধারণের ক্রয় যোগ্য দ্রব্য সম্ভার। তাদের চাহিদা পূরণ হয় এতে। তাছাড়া রয়েছে লাঠিখেলা, কুস্তি আর ফকির-সাধুর আকর্ষণ। এতে আড়ম্বর নেই, অথচ এর প্রয়োজন অত্যধিক।

আমার উপস্থিতি এই সব মেলাতেই হয়ে থাকে। আমি ভালবাসি আসতে।

এক জায়গায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে রয়েছেন এক সাধু। কিছু-কিছু মানুষ ভীড় করেছে সেখানে। সাধু চিম্‌টের ডগা দিয়ে ছাই তুলে নিয়ে সবার হাতে একটু-একটু করে দিয়ে চলেছেন। তারাও সাধ্যমত কড়ি ফেলছে। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে। কেউ-কেউ প্রণাম করছে।

পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক মোল্লা। তিনি যেতে যেতে থেমে গেলেন। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। প্রশ্ন করলেন, — কী হচ্ছে এখানে?

ভক্তের দল বলে, — ওঁর ধুনির ছাই-এ অসুখ সেরে যায়।

— ঝুট্ — সব ঝুট্।

সাধু নড়ে চড়ে বলেন — কখনো না।

মোল্লা কটূক্তি করে ওঠেন।

সাধুও ক্ষিপ্ত হন।

একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলে, — এবারে সাধু টের পাবে।

— কেন? কেন?

— কাজী মহম্মদ জালালকে চোখ রাঙালে নিস্তার নেই।

হঠাৎ দেখা গেল ঝগড়া করতে-করতে সাধু চিম্‌টে দিয়ে কাজীকে এক খোঁচা লাগিয়ে দিলেন।

সংগে সংগে আগুন জলে ওঠে। কাজী সাহেবের সংগীরা সাধুকে পেটাতে থাকে। সাধুর শিষ্য-বর্গও নিস্তার পায় না।

আমি আর থাকতে পারি না। ছুটে যাই ওদের মধ্যে। সাধু আর কাজীর ভেতরে গিয়ে দাঁড়াই। বলি, — আপনারা মারামারি করবেন না কাজী সাহেব। সাধুজী আপনি শান্ত হোন। এই মেলা নষ্ট করবেন না। অনেক লোক এসেছে, তাদের ক্ষতি করবেন না।

কিন্তু কোথা থেকে একটা লাঠির আঘাত আমার মাথায় এসে লাগে। মাথা ঘুরতে থাকে। চোখে অন্ধকার দেখি। তারপরই গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেয়ে পড়ে কপাল থেকে।

দুই পক্ষই দেখলাম, একজন রমণী এইভাবে আহত হওয়ায় হকচকিয়ে গেল। সাধু তাঁর ধুনি নিভিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। কাজী সাহেব চলে গেলেন ঠিক বিপরীত দিকে।

অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করি। তবু গরীবদের এই সমাবেশে এ-ধরনের তিক্ততা দেখে আমার কান্না পায়। একটি 'শের' জানতাম আমি। তার সুরও দিয়েছিলাম নিজে। মনে মনে ভাবি, নর্তকী হলেও পৃথিবীতে দেখার মত কি কিছুই নেই আমার? আমার এই মাথার আঘাত যেমন আরও দু-চারটি মাথার আঘাতকে বাঁচিয়েছে, তেমনি আমার সংগীত কি সহস্র মানুষের মনকে বাঁচাতে পারবে না?

কষ্ট হয়। খুবই কষ্ট হয়! তবু গেয়ে উঠি —

হিন্দু কহে সব্‌ হাম্‌ বড়ে
মুসলমান কহে হাম্‌
এক-মুঙ্‌ কো দো ফৌদ হৈ
কৌন্‌ জিয়াদা কৌন্‌ কম্‌।
কৌন্‌ জিয়াদা কৌন কম্‌
করনে নাহি কাজিয়া
এক রাম কা ভগৎ হৈ
দুঝে রহ্‌মন্‌ — সে রাজিয়া।

আমার যন্ত্রণা তীব্র হয়ে ওঠে। শরীর অবসন্ন বোধ হতে থাকে। কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে আসে। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টায় গেয়ে চলি। কারণ আমি লক্ষ্য করি সংঘর্ষের আবহাওয়া অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কাজী ও সাধু বিদায় নেবার পর অভাবী মানুষেরা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আমি অতি কষ্টে নৃত্যের তালে-তালে দূরে সরে আসি। পা অবশ হয়ে আসলেও থেমে পড়ি না। আমার চারদিকের ভীড় বাড়তে থাকে। সেই ভীড়ে বিস্ময়, ভীতি আর সব কয়টি

চোখে বিষন্নতা।

রক্ত ঝরার বিরাম নেই। আর পারি না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। অস্পষ্ট দেখতে পাই কয়েকজন আমার দিকে ছুটে আসছে। কেন আসছে? তারপর সব অন্ধকার হয়ে যায়। কিছু আর মনে নেই।

•

একটা আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আমি চোখ মেলি। কী যেন স্বপ্ন দেখছিলাম একটু আগে? মনে নেই। চিন্তাপ্রবাহে কেমন একটা ওলট-পালট ভাব। তবে একটা মধুর আবেশ আমাকে ভরিয়ে রাখে। অথচ কেন এই আবেশ বুঝতে পারি না।

চোখ মেলতেই সামনের ছোট প্রদীপটা জ্বলতে দেখি। ভাবি, প্রদীপটা জ্বলছে কেন? আমি কি নিভিয়ে দিয়ে ঘুমোইনি? সেটি নেভাতে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে পারি না। প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি মাথায়। কাতরোক্তি করে শুয়ে পড়ি।

সংগে সংগে সব কিছু মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় মেলার কথা। সাধু আর কাজীর কথা। আর আমার নাচের কথা।

কিন্তু আমি নিজের ঘরে কিভাবে এলাম? বড়-বড় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইতেই দেখি একজন পুরুষ নিশ্চল মূর্তির মত অদূরে বসে রয়েছে। চিনতে পারি না। আলো বড় অস্পষ্ট। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। উঠতে গিয়ে যেটুকু শক্তি ক্ষয় হয়েছে তাতে দৃষ্টি আরও আবছা হয়ে গিয়েছে।

অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে আমার দু-চোখের কোল বেয়ে। মুছে ফেলব তেমন শক্তি নেই — ইচ্ছাও নেই। নিশ্চল পুরুষ-মানুষটি নিশ্চয় খুব সহৃদয় ব্যক্তি। আমাকে অচেতন অবস্থায় কুটিরে পৌঁছে দিয়ে কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে চলে যাননি। আমার সেবায় ব্যস্ত রয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি আমাকে চেনেন। নইলে আমার কুটির খুঁজে পেতেন না। অথচ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছি না।

দেওয়ালের গায়ে পুরুষটির কম্পিত ছায়া পড়ে। তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এগিয়ে আসছেন। আমি সাধ্যমত আমার ডান হাত একটু উঠিয়ে তাঁকে আহ্বান জানাই।

তিনি আমার হাতটি ধরে ফেলে পাশে বসেন। তাঁর মুখ প্রদীপটিকে ঢেকে দিল। দেখতে পাই না ভাল করে। তাঁর গা থেকে একটি স্নিগ্ধ সুবাস আমার নাকে লাগে। আরাম বোধ করি।

অস্ফুট কণ্ঠে বলি, — আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমার প্রাণদাতা আপনি।

— না রাণাদিল্। যারা বাঁচিয়েছে তাদের আমি অনুসরণ করেছিলাম মাত্র। আমি তোমার কুটির চিনতাম না।

— কে? কে আপনি? আপনার পরিচয়?

— তুমি কি আমায় চিনতে পারবে?

— আপনার স্বর আমার খুবই পরিচিত। কিন্তু তা কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। অথচ কি আশ্চর্য সাদৃশ্য।

— সম্ভবত অন্য কারও কণ্ঠস্বরের সংগে মিল রয়েছে। তুমি আমায় চেনো না।

— কখনো আপনাকে দেখিনি?

— হ্যাঁ, দেখেছ বটে। অনেকদিন আগে। তেমন কিছু নয়। তাতে মনে থাকে না।

— আপনার কণ্ঠস্বর ঠিক বাদশাহ্‌জাদা দারাশুকোর মত।

— আশ্চর্য!

— কেন? একথা বলছেন কেন?

— তুমি আমায় মনে রেখেছ রাণাদিল্? কণ্ঠস্বর পর্যন্ত।

— বাদশাহ্‌জাদা?

আমি চোখ বন্ধ করি। চোখের জল বাঁধ মানে না। এতক্ষণে মনের মধ্যের মধুর আবেশের স্মৃতি অল্প-অল্প স্মরণ হয়।

— আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি রাণাদিল্। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

— অপমান? এ আপনি কী বলছেন বাদশাহ্‌জাদা? আর কৃতজ্ঞতা! আমার প্রতি? না না—

— তুমি আমার কথার এতটা মূল্য দিয়েছ, অথচ প্রতিদানের প্রত্যাশা করনি। তুমি হারেমে না গিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াও।

— আপনার কথার মূল্য? কোন্ কথা বাদশাহ্‌জাদা?

— যে নামে তুমি সবার কাছে প্রিয়, সেই নামে পরিচিত হতে আমিই বলেছিলাম রাণাদিল্।

লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। অথচ লজ্জা আমাদের অংগের ভূষণ হবার কথা নয়। আমরা পথের নর্তকী। আমাদের লজ্জা দেখাতে হয় অভিনয়ের ছলে। সেই লজ্জাকে সত্যি বলে কল্পনা করে নিয়ে অনেকে খুশী হয়।

— বল রাণাদিল্, এতটা মূল্য কেন দিলে?

এ আমি কোন্ আগুনের খেলা নিয়ে মত্ত হয়েছি? এ যে সর্বনেশে খেলা।

ছি ছি, দারাশুকোর সংগে সস্তা প্রেমের খেলা আমি খেলতে পারি না। এমন হলে দেওয়ান-ই-খাসের সেই ঘটনার পরে সুজার হারেমের এককোণে আমার স্থান হয়ে যেত। আমি নর্তকী। কিন্তু অন্তরে আমি নারী। নারীত্বের অবমাননা সহ্য করার ভয়ে বাদশাহ্ আর আমীর ওমরাহ্‌র মন হয়ের চেষ্টা করিনি। ওস্তাদজীর ইচ্ছা সত্ত্বেও নয়। আমি পথে বার হয়েছি।

—বল রাণাদিল্।

—কি বলব বাদশাহ্‌জাদা ?

—আমার অনুরোধের এতটা মূল্য দিলে কেন ?

—ভয়ে।

দারাশুকোর মুখ দেখতে পাই না। সামান্য নীরবতার পরে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। ভেবেছিলাম সেই স্বরে থাকবে আত্মগরিমা। পরিবর্তে, অদ্ভুত একটা বেদনার রেশ ফুটে উঠল

—ভয়ে। ও—

—আপনাদের যে ভয় করতে হয় বাদশাহ্‌জাদা। একথা কি আপনার জানা নেই ? শুনেছি তাতেই আপনাদের আনন্দ।

—হ্যাঁ। তা বটে। আচ্ছা, এখন আমি যদি বলি, ও-নাম বদলে দাও। দেবে ?

—না।

—ভয়ে ? ভয়েও দেবে না ?

—আমি যে ও-নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছি। আমি বদলাতে চাইলেও অন্যেরা শুনবে কেন ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন দারাশুকো। তারপর বলেন,—তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে রাণাদিল্। তুমি কথা বোলো না।

—না বাদশাহ্‌জাদা। আমার ভাল লাগছে। কিন্তু আপনি কষ্ট পাচ্ছেন এই পরিবেশে।

—আমি সব পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পারি। আমি ফকির সাধুদের আস্তানায় অনেক সময় রাত কাটাই। তুমি সংকুচিত হয়ো না। তোমার খাবার আনতে পাঠিয়েছি। এলেই চলে যাব।

—এত দয়া আপনার ?

—দয়া ! আমি তোমার প্রতি আরও এক ব্যাপারে কৃতজ্ঞ।

—একি বলেছেন আপনি ?

—ঠিক বলছি। যমুনার তীরে যে-মেলায় তুমি গাইছিলে, সেখানে এক

ফকির সাহেবের আসার কথা ছিল। তাই আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি তিনি আসেন নি। ফিরে আসছিলাম। সেই সময়ে ভেসে এলো তোমার গানের কলি। ভেতরটা নাড়া দিয়ে উঠল আমার, গানের কথা শুনে। ঠিক যেন আমার মনের কথা। আর কী মিষ্টি গলা। তুমি নর্তকী আমি জানি। কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় তুমি সংগীতজ্ঞা। আমার এই ছদ্মবেশে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলাম। তোমার রক্তাক্ত মুখ দেখে চমকে গিয়েছিলাম। তবু গান শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

দারাশুকোর পোষাক সাধারণ। কিন্তু এই চেহারা, আর গায়ের এই সুঘ্রাণেও কি কেউ তাঁকে চিনতে পারল না? হয়ত ওরা তন্ময় ছিল। ওরা রক্তাপ্লুত নর্তকীর আচরণে বিহ্বল ছিল। কোন কিছু খেয়াল করার অবকাশ পায়নি।

—আমি দেখলাম, তুমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলে!

—আমায় চিনতে পারলেন আপনি?

—না। চেনা সম্ভব ছিল না ওই অবস্থায়। কিন্তু নাম শুনলাম তোমার। দেখলাম ওদের তুমি অতি পরিচিত। ওদের প্রত্যেকের মুখে তোমার নাম উচ্চারিত হতে থাকে। নর্তকী রাণাদিল্। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে ধরাধরি করে একটি শকটে তুলে তোমায় ওরা এখানে নিয়ে এল। আমি অনুসরণ করলাম।

আমার হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে আবার অশ্রু উদ্গত হয়ে চোখের পাতা ভিজিয়ে দিল।

—ওরা তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে রাণাদিল্।

—ওরা মহানুভব।

—তোমার কাহিনী ওদের মুখে আমি শুনেছি। শুনে আমিও তোমায়—

—বাদশাহ্জাদা!

—বল রাণাদিল্।

—ওরা আমায় রেখে চলে গেল?

—যেতে চায়নি। আমিই ফিরিয়ে দিয়েছি। নিজের পরিচয় দিতে ওরা ভীষণ অবাক হল। তারপর একান্ত অনিচ্ছায় চলে গেল। ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা মন্তব্য শুনলাম,—'ওঁদের তো হাজার নর্তকী রয়েছে। তাতেও সন্তুষ্ট নন? আমাদের মাত্র রাণাদিল্। তাকে ছিনিয়ে নিতে চান।' আমি জবাব দিতে পারিনি। মন্তব্যকারীকে খুঁজে বার করার চেষ্টাও করিনি।

—কেন বাদশাহ্জাদা ?

—জানিনা।

—আপনি সত্যিই ছিনিয়ে নিতে চান ?

—যদি বলি, হ্যাঁ ?

—আমি যাবোনা। যেতে চাইনা বলেই পথে বের হয়েছি। আমি ওদের।

—ও কথা পরে হবে। কিন্তু তোমায় আমি সত্যিই চিনতে পারিনি রাণাদিল্। তোমার রক্তমাখা মুখ আর রোদের তাপে তামাটে রঙ আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। পরে অবশ্য চিনেছিলাম।

—কখন ?

—যখন সবাই চলে গেল। যখন আমি তোমার মুখের রক্ত ভালভাবে মুছে দিলাম। বুঝলাম, এ রাণাদিল্ আমারই—

—কী বলছেন বাদশাহ্জাদা ?

--না। আমি বলতে চাই, আমারই দেওয়া নামের রাণাদিল্। অবাক হয়েছিলাম। সেই আশ্চর্য সুন্দরী পথে-পথে ঘুরে বেড়ায় ?

—হ্যাঁ, কিল্লার কথা ভাবলে ভয় হয়। তাই পালিয়ে এসেছি পথে।

—তোমাকে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু পথে খুঁজিনি। জানো, সুজার হারেমে গুপ্তচর লাগিয়ে খোঁজ নিয়েছি ?

—কিন্তু কেন ?

প্রদীপের আলো নিভু-নিভু। দারাশুকোর ছায়া দেওয়ালে অস্থির ভাবে কাঁপতে থাকে। দূরে কোথাও নহবৎ-এর আওয়াজ শোনা যায়।

—জানিনা। এখনও বলতে পারছি না। তবে আজ তোমাকে খুঁজে পেয়েছি। সুযোগ হলে বলব।

—আপনি আবার আসবেন ?

—হ্যাঁ।

—নাদিরা বেগম—

দারার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসি আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না।

—আমি জানি রাণাদিল্, একথা উঠবে। তুমি কি জানোনা, আমাদের রক্তের বাঁধ-ভাঙা নেশা একটি নারীর দ্বারা কখনো মেটে না ?

তাঁর কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক উত্তেজনায় আমার দুর্বল শরীর কেঁপে উঠল। বার'বার মন্ত্রোচ্চারণের মত আপন মনে বলতে থাকি,—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো—তাইতো। আমার ভুল—মস্ত ভুল।

—তুমি কিছু বলছ রাণাদিল্ ?

—না বাদশাহ্জাদা।

—তুমি কিছু মনেও করছ না ?

—ঠিক জানিনা।

—নিশ্চয়ই করছ। শোনো রাণাদিল্, নিষ্ঠুর সত্যি কথাটা বললাম এই মাত্র। কিন্তু আমার বেলায় ঠিক তা নয়। যেভাবে বললাম, অন্তত সেভাবে নয়। নাদিরাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি। এর মধ্যে খাদ নেই।

একি রাক্ষসী! তোর ভেতরে হিংসা উঁকি দেয় কেন ? ছি ছি, এই তোর মন ? এরই বড়াই করিস ? টুঁটি চেপে ধর। এই মুহূর্তে টুঁটি চেপে ধর। নইলে ওই হিংসা তোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—ডুবিয়ে মারবে।

—আপনার—আপনার কথা শুনে শ্রদ্ধা হচ্ছে বাদশাহ্জাদা।

—শ্রদ্ধা ? ও। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা থাকবে তো ?

—থাকবে না ? আপনি—

—থাক্। প্রশংসা শুনতে চাইনা। শুধু বলতে চাই নাদিরাকে ভালবেসেও সেই প্রথম দিন তোমাকে দেখা মাত্র এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। সেই আকর্ষণ একবিন্দুও কমেনি—বরং বেড়েছে।

হায় ঈশ্বর! এ আবার কোন্ ধরনের কথা ? এমন কথনো শুনবো ভাবিনি। পুরুষের হৃদয়কে কি ভাগ করা যায় ? হয়তো যায়। নারী হয়ে কি করে বুঝব ? কিংবা হয়ত নাদিরার প্রতি ভালবাসা, আর আমার প্রতি শুধু মুঘল রক্তের নেশা। না। আমি ওই মধুর কণ্ঠস্বরে ভুলব না। আমি শক্ত হব।

—রাত হল বাদশাহ্জাদা।

—হ্যাঁ।

সেই সময় একজন এসে খাবার এনে রাখে। দারাশুকোর সংগে এত কথাতেও আমি ক্লান্তি অনুভব করছি না।

—আমি উঠি রাণাদিল্।

—আপনার সংগে কেউ আসে নি ?

—হ্যাঁ, এই তো হাকিম খুদাদোস্ত রয়েছেন।

—উনি হাকিম ?

—হ্যাঁ, তোমার ভাগ্য বলতে হবে। উনিও ফকির সাধুর সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। তাঁদের কাছে অনেক রকমের গাছের মূল পাওয়া যায়। কাজে লাগে।

—বাদশাহ্জাদা, আপনি কি অজাতশত্রু ?

দারাশুকো এবারে একটু উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন। বলেন,—না রাণাদিল্। মুঘল বংশের কেউ অজাতশত্রু নয়। বিশেষ করে শাহানশাহ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের

শত্রু আর মিত্রের সংখ্যা সমান। বরং শত্রুর দিকটা ওজনে বেশী ভারী। তবে তুমি যা প্রশ্ন করতে চাইছ তার উত্তর এই 'দুশ্‌মন্‌ খুশ'।

দারাশুকো তাঁর পরিচ্ছদের ভেতরে লুকানো একটি লম্বা অস্ত্র বার করেন। প্রদীপের আলোতেও সেটি ঝলসে ওঠে।

—দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করা যায় বাদশাহ্‌জাদা।

—হ্যাঁ, তার জন্যে আমার চারিদিকে অনেকগুলো অদৃশ্য মানুষ চোখ রেখেছে!

লজ্জিত হই। সামান্যা নর্তকী হয়ে হিন্দুস্থানের অধীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধির পরিমিতি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া আমার সাজে না। এ শুধু তাঁর নিজের বুদ্ধির ব্যাপার নয়, বংশ পরম্পরা-লব্ধ বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত অতি যত্নের সংগে রূপায়িত কতকগুলো নিয়ম কানুনের ব্যাপার।

পথ আমার আশ্রয়। পথ আমার বন্ধু। পথই আমার প্রভু।

মাথার আঘাত ভাল হতে আবার পথে নেমে পড়ি। দারাশুকোর সেদিনের উপস্থিতি আমার অন্তরে যে প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তাই বলে, দিনের পর দিন তাঁর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে জীবন কাটানোর কথা কল্পনা করতে ভীত হই।

যতদিন শয্যায় পড়ে ছিলাম, পথ্যের জন্য ভাবতে হয়নি আমাকে। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পথ্য নিয়মিতভাবে পেয়েছি। তখন প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না।

আমার পথের বন্ধুরাও আমার জন্যে বেদানা, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌ এবং আরও অনেক কিছু রেখে যেত। বাদশাহ্‌জাদার অনুগ্রহের পথ্য আমি কয়েকদিন খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। একটু সবল হতেই সেগুলোকে এক-পাশে সরিয়ে রেখে পথের বন্ধুদের আদরের দেওয়া জিনিষ খেতে সুরু করলাম।

একদিন একটি যুবক কিছু ফল এনে আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল। সে হয়ত আমার সংগে কথা বলতে চায়।

—বসো।

যুবকটি বসে। বয়স আমার চেয়ে কিছু বেশী। সে আমার মাথার দিকে চেয়ে থাকে। চুলের ভেতর দিয়ে সেখানকার কাটা দাগ দেখা যায়।

—তুমি আর একদিনও ফল এনে দিয়েছিলে। কেন দাও?

—দেবনা বলছ রাণাদিল্‌?

—দেবেনা কেন? না দিলে আমি তো পেতাম না। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

—তুমি কেন অমন সুন্দর গান গাও। কেন নেচে বেড়াও পথে পথে?

—নইলে চলবে কি করে?

—শুধু তাই?

যুবকটির মুখ ব্যথায় ভরে ওঠে। আমার কষ্ট হয়। আমার লজ্জা হয়। তার শেষের কথাটি যেন একটি আর্তনাদ।

আমি বলি,—আমায় ভাল লাগে।

এবারে মিষ্টি হেসে সে বলে,—আমারও তাই।

—কি?

—ভাল লাগে।

—কি ভাল লাগে?

—তোমায় দিতে।

—কেন?

যুবকটি ভেবে-ভেবে উত্তর খুঁজে পায় না। এমন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সে আশা করেনি। শেষে অস্পষ্ট স্বরে বলে,—তা তো জানি না।

পুরুষের প্রথম যৌবনের এ-ও এক ধরনের উচ্ছ্বাস। যে-নারীর ভেতরে সে সামান্য বিশেষত্ব দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। হয়ত এই আকর্ষণের ভেতরে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতভাবে কাজ করে নারীর দেহ। হয়ত কেন? পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণও কি তাই নয়? পার্থক্য শুধু পুরুষেরা বোধ হয় স্পষ্ট সেটা বুঝতে পারে। নারীরা পারে না। দারার প্রতি আমার আকর্ষণ কিসের জন্য জানি না। নারী বলেই সম্ভবত।

অনুকম্পা জাগে মনে। যুবকটিকে সাহায্য করার জন্যে বলি,—আমি যদি না বাঁচতাম?

—ও কথা বোলো না রাণাদিল্।

—কেন?

—শুনলে কষ্ট হয়।

—এত?

—হ্যাঁ।

—তুমি বিবাহিত?

—একথা বলছ কেন?

—না, এমনিতে।

—না। শোনো রাণাদিল্। আমি তোমার গান ভালবাসি, তোমার নাচ ভালবাসি।

নির্লজ্জের মত মুখ ফস্‌কে বার হয়,—আর আমাকে ?

—খুব। যার নাচ-গান ভালবাসি, তাকে ভালবাসব না ?

সেই সময়ে দারাশুকোর লোক এসে উপস্থিত হয়। সংগে তার প্রতিদিনের মত নানান ধরনের দ্রব্য।

সে চলে গেলে যুবকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে থাকে। ওগুলোর পাশে তার প্রদত্ত সামগ্রী নিষ্প্রভ দেখায়। সে সহসা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি তার আনা ফল কয়টি হয়ত তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হয়।

আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। চিৎকার করে উঠি,—দাঁড়াও।

সে থমকে ঘাড় ফিরিয়ে আমার মুখের দিকে চায়।

—ওগুলো কোথায় নিয়ে চললে ?

—আমার অন্যায় হয়েছে রাণাদিল্। বাদশাহ্‌জাদা, তোমার দেখাশোনা করছেন জেনেও এই তুচ্ছ ফল কয়টি আনা উচিত হয়নি। আমি বেওয়াকুব।

—না।

যুবকটি অদ্ভুত হেসে ওঠে। ঠিক শাণিত ছুরি।

—হাসছ কেন ?

—এমনিতে রাণাদিল্।

—না। বলতে হবে। বলতে হবে তোমায়।

—লাভ নেই রাণাদিল। আমি চলি।

—তুমি নাকি আমাকে ভালবাস ?

—সেটাও অন্যায়। তোমার মত নর্তকীকে সারা দেশের মানুষের ভালবাসাও আটকে রাখতে পারবে না। তারা বড় দুর্বল—বড় অসহায়।

—মিথ্যে কথা।

—জানি না তুমি মন থেকে বলছ কিনা। হয়ত মন থেকেই বলছ। তবে কথাটা বলে রাখলাম—অনেক পরে তোমার জীবনের সংগে মিলিয়ে নিও।

—কতই বা বয়স তোমার ? এই বয়সে খুব বেশী বুঝতে শিখেছ ভাবো ?

—না রাণাদিল্; এটা বুদ্ধির কথা নয়। মনের কথা। মন বুদ্ধির চেয়ে

—কে তুমি ? তোমার নাম কি ?

—আমার নামটুকু জানতে পারো। আবদুল্লা। সাধারণ মানুষ। খেটে খাই।

—তুমি এভাবে আমায় অপমান করলে আবদুল্লা ?

—না তো ? তোমায় আমি সম্মান করি রাণাদিল্। বাদশাহ্‌জাদা যাকে অনাদর করতে পারেন না সে সম্মানের পাত্রী।

এবারে কান্নায় ভেঙে পড়ি। কাঁদতে কাঁদতে বলি,—সম্মান না, ছাই। তুমি একবারও বুঝতে চাইলে না, তোমাদের আমি কতটা ভালবাসি। একবারও জানতে চাইলে না একা কেন রাস্তায় রাস্তায় নাচি—গাই। হারেমে কি আমার জায়গা হতো না? তোমরা শাহ্‌জাদা আর বাদশাহ্‌জাদাদের চেয়েও নিষ্ঠুর। তাঁদের চেয়েও হৃদয়হীন।

—না।

—আলবৎ। নিজের চোখে একবার গিয়ে দেখে এসো পাশের ঘরে। প্রথম দু-চারদিন ছাড়া ওদের দেওয়া জিনিষ একবারও স্পর্শ করিনি। তোমাদের দানে আমাদের দিন চলছে। তোমাদের কেউ যেদিন না আসে, আমি সেদিন অভুক্ত থাকি।

যুবক থ' হয়ে যায়। সে পাশের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে বার হয়ে এসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আমার হাতদুটো তুলে নিয়ে বলে,—রাণাদিল্, আমাকে ক্ষমা কর।

—তোমার সংগে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে আবদুল্লা।

—জানি। কিন্তু তুমি জান, আমি তোমার দেহের জন্যে তোমাকে ভালবাসি না। ক্ষমা কর।

—করেছি আবদুল্লা। আসলে আমিই অপরাধী। কেন জান?

—কেন?

—দারাশুকো আমায় আকৃষ্ট করেন।

—ও।

—তাই বলে আমি হারেমে যাবো না আবদুল্লা। কয়েকদিনের মধ্যে আমায় আবার পথে দেখতে পাবে।

—কিন্তু যেদিকে তোমার আকর্ষণ সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলা কতদিন তোমার পক্ষে সম্ভব হবে?

কথা বলতে কেন যেন বড় কষ্ট হচ্ছিল। তবু তরুণটিকে চলে যেতে দিতে ইচ্ছে হল না। তার একখানা হাত চেপে ধরে রাখলাম।

—ছেড়ে দাও রাণাদিল্। আমার অনেক কাজ।

—আবার আসবে তো?

—সে কথা তুমি জান। তবে তোমার কথা আমার মনে থাকবে চিরকাল। শুধু আমার কেন, আমার মত প্রতিটি মানুষের, যারা তোমার নাচ দেখেছে, গান শুনেছে।

আবদুল্লা চলে যায়।

পথেই দেখা হয়েছিল আবদুল্লার সঙ্গে কয়েকদিন পরে। চক-এর ভেতরে ছিল বিস্তর মানুষ। সেইখানে আসর জমিয়েছিলাম। বহুদিন পরে আমাকে দেখে দিল্লীর মানুষেরা পাগল হয়ে উঠল। কী করবে ভেবে না পেয়ে, যার কাছে যতটুকু অর্থ ছিল রুমালে জড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল আমার দিকে। সেই অজস্র রুমাল আমার গায়ে লেগে নৃত্যরত পায়ের কাছে পড়ে পড়ে জমা হতে লাগল।

—রাণাদিল্ এসে গিয়েছে। আমাদের রাণাদিল্ আবার এসে গিয়েছে।

চারদিকে হুলুস্থুল।

তারই মধ্যে নজর পড়ল আবদুল্লার ওপর। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে। তার মুখে খুশির জোয়ার। অথচ সে সবার পেছনে। এগিয়ে এলো না। কথা বলল না। আমার দিকে রুমালও ছুঁড়ে দিল না।

ও কি আমায় ভালবাসে? অর্থাৎ পুরুষ যেভাবে নারীকে ভালবাসে? জানি না। ভাবি, ও ভালবাসলেও আমি তো ওকে ভালবাসতে পারব না।

ও বুঝতে পারে, আমি ওকে দেখেছি। কিন্তু সেজন্য কোনরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ করল না। গান থামলে শ্রোতাদের সংগে মিলে মিশে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবদুল্লা কি তবে বিশ্বাস করে না, আমি চিরকাল পথেই থাকব? বিশ্বাস না করলে ভুল করবে। কারণ দারাশুকোর প্রতি আমার আকর্ষণ যত প্রবলই হোক, তাঁর একজন উপপত্নী হয়ে হারেমে কখনই ঢুকবো না। আর সেভাবে না গেলে বেগম করে দারা একজন নর্তকীকে কখনো নিয়ে গিয়ে তুলবেন না হারেমে। আমার প্রতি প্রেমের বন্যায় ভেসে গেলেও নয়। মুঘল বংশের দুর্নাম রটতে দেবেন না তিনি। যদি উন্মাদ হন, তবুও শাহানশাহ্ এবং অন্যেরা এই অনাচার বরদাস্ত করবেন না।

চক্-এর ভীড় কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকি। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। দিল্লীর অধিবাসীরা কিছুদিন থেকে বৃষ্টির প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দু এক ফোঁটাও ঝরে পড়ল না। মানুষ যা যাচ্ঞা করে ঠিক সেই জিনিসটাকেই বিলম্বিত করে রসিকতা করেন যেন। সেই রসিকতা খুবই নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, যখন আকাঙ্খার বস্তুটি শূন্যে বিলীয়মান হয়ে যায়।

আমার কী আকাঙ্খা? দারাশুকোর প্রেম? সেই প্রেম দারাশুকো দিতে পারে বৈকি। কিন্তু কেমন করে বুঝব তাঁর গভীরতা কতটুকু? অথচ প্রেম প্রদর্শন শাহ্জাদা ও বাদশাহ্জাদাদের বাতিক। এই বাতিক নতুন কিছু নয়।

তাতে মন ভরে ? অন্তত দারাশুকো আমার জন্যে কতটা অগ্রসর হতে পারে ? দিনরাতের কোন একসময়ে আমার সংগে প্রেমের খেলা খেলে গিয়ে রাতে হারেমে নিশ্চিন্ত মনে নাদিরার সংগে সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি করবে। এতে দারার কোন্ রূপ প্রকাশ পাবে ?

সুতরাং আমার আকাঙ্খার মূলকে এখনি কঠোর হাতে ছিন্ন করে ফেলা ভাল। একে বাড়তে দেওয়া বোকামি।

দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আকাশে চাতক পাখীর দল করছে ছোটাছুটি। ওরা নাকি নীচু হয়ে জল খেতে পারে না। ঈশ্বর ওদের ওভাবে সৃষ্টি করেন নি। কোন জলাশয়ের পাশে বসে একটু গা ভিজিয়ে নেওয়া কিংবা তৃষ্ণার জলটুকু পান করে নেওয়া ওদের কপালে নেই। হয়ত ধরণীর মাটির ছোঁয়ায় সরোবরের স্বচ্ছ জলও হয়ে যায় কলুষিত। ওরা পবিত্র। পাখী হয়েও তাই পাখীর দলছাড়া। ওদের সংগে সেই সব মানুষের তুলনা চলে, যারা ধরিত্রীতে জন্ম নিয়েও ওপর দিকে চেয়ে থাকে, পৃথিবীর পংকিলতা তাদের মনে লাগে না। পবিত্র জিনিষই তারা পায়—কিন্তু বড় অল্প, বড় দেরীতে।

পৃথিবীর কোন্ মানুষ চাতক পাখীর দলে ? শিল্পী ? কবি ? ঈশ্বর প্রেমী ? জানি না।

একটি গাছের নীচে মতলব খাঁকে বিমর্ষ মুখে বসে থাকতে দেখে অবাক হই। হারেম ছেড়ে এই অবেলায় বৃষ্টির মধ্যে সে এখানে কেন ?

তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সে দেখতে পায় না আমাকে। ডাকি নাম ধরে।

চমকে ওঠে মতলব খাঁ।

—তুমি এখানে কি করছ মতলব ?

—কোথায় যাব বহিন বলে দাও।

—এ আবার কোন্ ধরনের কথা ?

—আমি হারেমের আর কেউ নই।

—সে কি ! বরখাস্ত করা হয়েছে তোমায় ?

—না। তাও বরং ছিল ভাল। অন্যের হুকুম তামিল করতে হতো না। আমার ওপরে একজন এসেছে।

—কে সে ?

—চিনবে না। কাকেই বা চেন তুমি। তবু নামটা শুনে রাখো। বাদশাহ্জাদা কখনো যদি আবার তোমার কাছে যান, একটু বলবে আমার হয়ে ?

—না মতলব। ওভাবে বলতে পারব না। তাছাড়া বলবই বা কেন? কেন তিনি আমার কথা শুনবেন?

—তা বটে। তবু নামটা শুনে রাখো। বাকী বেগ। খোজা।

—কেমন লোক?

—সেকথা যদি শুনতে চাও, তবে বলব অত বুদ্ধি খুব কম মানুষেরই আছে। ওকে সামান্য হারেমের কর্তা না করে বাঙলা কিংবা বিহারের কর্তাও করা যেতে পারে।

—বলছ কি মতলব?

—হ্যাঁ, বহিন। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। ওর অধীনে অন্য যে কোন কাজ করতে আমি রাজী। কিন্তু হারেমে ওর হুকুম মানতে ইচ্ছে হয় না। এতদিন আমার হুকুম সবাই মানত।

—তুমি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ ভাই। তোমার কথা সত্যি হলে বাকী বেগ বেশীদিন হারেমে পড়ে থাকবে না। ও-ধরনের মানুষ এত অল্প দায়িত্বে সুখী থাকতে পারে না।

—বেঁচে থাকো বহিন। তোমার এই কথায় আমি সান্ত্বনা পেলাম।

বৃষ্টি একটু প্রবল হয়। আমি আর মতলব গাছের কাণ্ডের গা ঘেঁসে দাঁড়াই। বৃষ্টির সংগে ধূলি-ঝড় চারিদিক অন্ধকার করে তোলে।

দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকি। আশেপাশে এমন কোন আস্তানা নেই যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেব।

দিন শেষ হয়ে আসছিল।

কিছুক্ষণ পরে ঝড়-বৃষ্টি থেমে যায়। রাস্তার ধুলো মরে গিয়েছে। মাটির গন্ধ নাকে আসে। সুন্দর গন্ধ। বেশ ঠাণ্ডা ভাব।

—চল বহিন। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

—চল। হারেমের খবর কি? নাদিরা বেগম?

—ভাল। বেগমসাহেবা মাটির মানুষ। সুন্দর স্বভাব। দরদী।

—বাদশাহ্‌জাদা খুব ভালবাসেন ওঁকে। তাই না?

—সে আর বলতে। অন্য কারও দিকে ফিরেই তাকান না বলতে গেলে।

—তাঁর হারেমে আর কতজন আছে?

—অনেক। কিন্তু বললাম তো। আছে, এই পর্যন্ত। হঠাৎ এত কথা শুনতে চাও কেন বহিন?

—এমনিতে। ওঁদের কথা শুনতে কার না ভাল লাগে?

—তোমার ভাল লাগে বলে বিশ্বাস হয় না।

আমি হাসি। মতলব মিথ্যে বলেনি। কিন্তু দারাশুকোর বেলায় ব্যতিক্রম আছে বৈকি। কাটিয়ে উঠতে দেরী হবে কিছুটা। মতলব চলতে চলতে কী যেন ভাবে। অনুমান করি, পদাবনতিতে মানসিক অশান্তিতে ভুগছে।

—মন খারাপ কোরো না মতলব।

—না। নসিবকে মানতেই হবে।

—অন্য বাদশাহ্‌জাদাদের খবর কি?

—সুজা?

—হ্যাঁ।

—তিনি তাঁর কাজ করে চলেছেন। বাদশাহ্‌জাদাদের মধ্যে ওঁর মত বুদ্ধিমান কেউ নেই। তেমনি সাহসী। কিন্তু এক দোষে সব পণ্ড।

—আওরঙজেব তো খুব বুদ্ধিমান।

—আলবৎ। কিন্তু সুজার মত অতটা নন। তবে তিনি হচ্ছেন আসল মানুষ। কাজ বোঝেন। তাঁকে বড় ভয় করে।

—কেন?

—তিনি দারাশুকোকে সহ্য করতে পারেন না। তাঁর এত ক্ষমতা বরদাস্ত করতে পারেন না।

—খুব ক্ষমতা বুঝি?

—হ্যাঁ। তাঁর মনসবদারী, সুজা আওরঙজেব আর মুরাদের যোগ করলে যত হয়, তার চেয়েও বেশী। ভাবতে পারো বহিন, বিশ হাজার জাঠ্‌ আর দশহাজার সওয়ার।

আমি কিছুই বুঝলাম না। অবশ্য কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে মতলব যেভাবে চোখ বড় বড় করে মণি দুটোকে উল্টে দিল তাতে অনুমান করলাম অস্বাভাবিক রকমের ক্ষমতা আছে দারাশুকোর হাতে।

আমিও বড় বড় চোখে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বললাম,—সত্যি?

—খোদাতায়লার কসম্‌ খেয়ে বলতে পারি। আরে এতো সবাই জানে। আওরঙজেবের মনের ভেতর থেকে সব সময় একটা ধোঁয়া উঠছে।

মতলব খাঁ আমাকে বাড়ীর সামনে অবধি পৌঁছে দেয়।

দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম এক ব্যক্তি বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মতলব বিদায় নিতে, সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। আমার মনে কৌতূহল জাগে। মনে হল, লোকটি আমাকেই চায়।

সে সামনে এসে বলে—আপনি রাণাদিল্‌?

—হ্যাঁ।

লোকটিকে দেখলে মনে হয়, নগরীতে সে নতুন এসেছে। তার মত অতি সাধারণ একজন মানুষ রাণাদিল্‌কে ঠিকই চিনত, যদি নগরীর পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ান অভ্যাস থাকত। কেমন যেন গোবেচারা ভাব।

—আপনার এখানে সারাদিনে আমি অনেকবার এসেছি। দেখা পাইনি।

লোকটির চোখদুটি ফোলা ফোলা। অনেক কেঁদেছে বলে মনে হয় দেখলে। এখনো সজল। কোন বিপদে পড়েছে। কিন্তু সেই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করতে হবে নাকি? নর্তকী রাণাদিল্‌?

—আপনি কে?

—আমাকে চিনবেন না। বাড়ী আমার এলাহাবাদের কাছে। আপনাকে দেখে পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। তবু আমার সংগে একটু যেতে হবে। অবিশ্যি এখন গিয়ে কি-ই বা করবেন। আসল সময়েই যেতে পারলেন না।

—কেন? কী হয়েছে?

—আপনাকে একটু গোরস্থানে যেতে হবে।

রীতিমত বিস্মিত হই। এই অবেলায় গোরস্থানে যেতে হবে অচেনা একজন মানুষের সংগে? লোকটা পাগল নাকি?

—আপনার নাম কি?

—মৈমুদ্দৌলা।

আমার মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে বুঝতে পারি। কারণ এর নিবাস এলাহাবাদের কাছে এবং নামও মৈমুদ্দৌল্লা। এলাহাবাদের মৈমুদ্দৌলা বলতে রসিক সমাজ যাঁকে জানে তিনি হলেন একজন সংগীতজ্ঞ। অদ্ভুত সাদৃশ্য। এ ব্যক্তি যে তিনি নন, দেখলেই বোঝা যায়। কোন বিশেষত্বই এর মধ্যে নেই। আর চোখের দৃষ্টি তো ঝাপসা হয়ে আছে।

লোকটি আমার মনোভাব বুঝতে পারে না। তেমন অবস্থা তার নেই। সে ছট্‌ফট্‌ করে। বলে,—চলুন। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—কেন যাব, বলবেন তো?

—ও, তাও বলিনি! উনি তো সারাদিন একবার আপনাকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছিলেন। এতবার ছুটে এসেও আপনাকে ধরতে পারলাম না। শেষে ওঁর মৃত্যু হল। তাই বলছিলাম যেতে। আপনি অন্তত দেখুন শেষবারের মত। আপনার হাতের মাটি পেতে চেয়েছিলেন কিনা মনে মনে, জানিনা।

এবারে আমি অধৈর্য হয়ে উঠি। চেঁচিয়েই বলি,—কার কথা বলছেন? মানুষটি কে?

মৈনুদ্দোলা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। ফোলা ফোলা চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বলে— তাও বলিনি? হা আল্লা! আমার ওস্তাদজী। ওস্তাদ কামাল-উদ্দিন আর নেই।

পৃথিবীটা আমার সামনে অন্ধকার হয়ে যায়। কতক্ষণ রাস্তার ধুলোয় পড়ে ছিলাম জানি না। চোখ মেলে দেখি লোকটি বসে রয়েছে আমার শিয়রে। বুঝলাম, মূর্ছা গিয়েছিলাম। মাথায় যে আঘাত পেয়েছিলাম, তার চেয়েও এ-আঘাত দুঃসহ।

লোকটি বলে,—আপনি ঘরে যান। আমি চলি। আপনার পক্ষে অতদূর যাওয়া সম্ভব নয়। প্রথমেই যদি জানতে পারতাম চঞ্চলবাঈ আর রাণাদিল্ একজনের নাম, তাহলে আপনাকে হয়ত অনেক আগে ধরতে পারতাম। ওস্তাদজী চঞ্চলবাঈ নামটি বার বার বলছিলেন।

লোকটিকে জাপটে ধরে বলি,—আমি যাব। আমাকে ফেলে যাবেন না। এইতো আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি। এই দেখুন আমার পা কাঁপছে না। আমাকে দয়া করে পিতাজীর কাছে নিয়ে চলুন। শুধু দেখব—শুধু দেখব তাঁকে।

সেই সময় আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই জানতে পারিনি কীভাবে গোরস্থানে গিয়ে পৌছলাম। বিখ্যাত ওস্তাদ মৈনুদ্দোলা কি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে শকটের ব্যবস্থা করেছিলেন?

জানি না। আজও জানিনা। আমার মনের ভেতরে তখন বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠছিল পিতাজীর বিভিন্ন সময়ের মুখ, বিভিন্ন সময়ের কথাবার্তা, শেষ যেদিন, তিনি আমাকে তাঁর কাছে যেতে না দিয়ে বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিলেন সেদিন তাঁকে চোখে দেখিনি। অথচ কী আশ্চর্য! সেদিনের ছবিও চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখলাম, শয্যায় রোগকাতর পাণ্ডুর মুখে লোকটিকে কথাটা বলেই তিনি ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন।

শব বাহকেরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে ছিল। না না, আমার জন্যে হবে কেন? পিতাজীর প্রিয়তম শিষ্য ওস্তাদ মৈনুদ্দোলার জন্যেই তারা অপেক্ষা করছিল। আমি কে? আমি রাস্তার সামান্য নর্তকী। আমি পিতাজীর অভিলাষ পূর্ণ করতে পারিনি। রসিক সমাজ আমার সংগীতের সমঝদারীর সুযোগ পায় নি। হারেমের শ্বেত মর্মরে আমার পদদ্বয় নূপুরের ঝংকার তুলতে পারে নি। আমি পিতাজীর মানস-কন্যায় রূপায়িত হতে পারিনি। ব্যর্থ হয়েছি। আমি পিতাজীর কেউ নই। বাহকেরা মৈনুদ্দোলার জন্যেই অপেক্ষা

করছিল।

সমাধিস্থল ঘিরে কখন গাঢ় অন্ধকার ঘনীভূত হয়েএসেছিল খেয়াল করিনি। স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। কী ভাবছিলাম, এতদিন পরে আর মনে নেই। হয়ত কিছুই ভাবছিলাম না। আমার মস্তিষ্ক একখণ্ড পাথরের মত নিশ্চল নিরেট হয়ে গিয়েছিল।

আমার সম্মুখে মাটির নীচে পিতাজী শায়িত। পৃথিবীতে আর কাউকে তো আমি ওঁর চেয়ে বেশি চিনিনি। আর কেউ তো ওঁর চেয়ে বেশী মংগলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না আমার।

কেঁদে উঠি,—পিতাজী, আমায় কেন ফেলে রেখে গেলে। নিয়ে যাও আমায়। আমি কিছু হতে চাইনা। আমি গান চাই না, নাচ চাই না। শুধু তোমার কাছে থাকতে চাই। পিতাজী—

কার করস্পর্শ মাথায়!

মৈনুদ্দৌলা।

—চল, চঞ্চল।

হ্যাঁ, যেতে হবে। এ ভাবে বসে থাকলে পিতাজী আসবেন না ফিরে। ফেরেনা কেউ। ফেরেনি কেউ কখনো। শোকে আমি পাগল হলেও পিতাজী ফিরে আসবেন না। তাই আমাকেই ফিরতে হবে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াই।

—আমি কালই চলে যাচ্ছি চঞ্চল। নইলে তোমার কাছে থাকতাম। ওস্তাদজী আমার চেয়েও তোমাকে বেশী ভালবাসতেন। তাছাড়া তুমি ওস্তাদজীকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাস। তাঁর সংগ পাবার জন্যে তুমি গান ছড়াতে পারো। আমি পারিনা। তাই তুমি আমার বড় আপন। তোমাকে পর ভাবতে পারি না।

ঠিক। এই মানুষটির চেয়ে আপন আর কে হতে পারে জগতে?

—সত্যিই আপনি আমার নিজের লোক।

—একটা কথা শুনে তুমি খুশী হবে চঞ্চলবাঈ। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ ওস্তাদজী তাতে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন।

আমি আরও শোকাকুলা হয়ে উঠলাম কথাটা শুনে।

এরপর পথ চলতে চলতে সেই অন্ধকার রাতে মৈনুদ্দৌলা যে কথা বললে মনে হল যেন দৈববাণী।

—তবে ওস্তাদজী একটি কথা বলে গিয়েছেন।

—কী?

—যতই তুমি স্বাবলম্বিনী হতে চাও না কেন, তোমার শেষ গন্তব্যস্থল মুঘল হারেম। কারণ আসল বস্তু কখনো দীর্ঘদিন পথের কিনারায় ধুলো মেখে পড়ে থাকে না। শেষ অবস্থান তাজের শোভাবর্ধনে।

বহুদিন পর গুলরঙকে আমার বাড়ীর দরজার সামনে দেখে চমকে উঠলাম। মতলব খাঁয়ের কাছে শুনেছি, তার ভাগ্যের এখন রমরমা অবস্থা। বাদশাহজাদা সুজাকে সে বেশ কিছুদিন ধরে অন্য নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এতে নাকি হারেমে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। গুলরঙ অসাধ্য সাধন করেছে। বাহাদুরী বটে তার।

ভারী সুন্দর দেখতে লাগছে গুলরঙকে। ওর গায়ের রঙ কোনদিনও উজ্জ্বল ছিল না আমার চেয়ে। অথচ এখন কত তফাৎ। এখন আমি কালো না হলেও তামাটে রঙ-এর ছোঁয়া আমার অংগের প্রতিটি স্থানে। অথচ গুলরঙ?

তাকে জড়িয়ে ধরে বলি,—তোর রূপ ফেটে পড়ছে।

সে গম্ভীর জবাব দেয়,—আর তুই? পেঁচী।

আমি হাসি। আমাকে ভাল না বাসলে ওর চোখে প্রকাশ পেতনা অতটা ক্রোধ।

একটি সুদৃশ্য অশ্বযান দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ীর সামনে। গুলরঙ এসেছে এতে।

—উঃ, এতদিনে মনে পড়ল আমাকে। ভেবেছিলাম ভুলে গিয়েছিস।

—সেকথা ভাবলে ভুল করবি না। তোকে দেখতে আসিনি।

—তবে? কেন এলি?

—এমনি। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। চোখে পড়ল বাড়ীটা। এককালে এখানে থাকতাম। তাই এসেছি নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনটাকে মিলিয়ে নিতে। কী ছিলাম, আর কোথায় উঠেছি। বড্ড ভাল লাগে এই পার্থক্যটুকু উপভোগ করতে।

—সত্যি, অনেক উঠেছিস। তোর ভাল হোক।

গুলরঙ হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলে,—ঢের হয়েছে। আমি চলি।

ব্যথা জাগে মনে। সত্যিই চলে যাবে ও এত তাড়াতাড়ি? আমাকে দেখতে তবে সত্যিই আসেনি?

মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। দাঁড়িয়ে থাকি চুপ করে।

গুলরঙ এবারে সত্যিই দু'পা এগিয়ে ঘরের চৌকাঠের ওপর পা দিয়ে বলে,—অনেক কাজ আছে। চলি।

আমি অপেক্ষা করি। চোখে বুঝি জল এসে গিয়েছিল। মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকাতে চেষ্টা করি।

—কী। কথা বলছিস না যে? আমি যাচ্ছি।

কোন রকমে ঘাড় কাত করে বলে,—আচ্ছা। আমার খুব আনন্দ হল এতদিন পরে দেখা হওয়ায়।

—যাই।

—এসো গুলরঙ।

ওকে আর আপনজনের মত সম্বোধন করতে পারি না। রাজ্যের সংকোচ এসে বাধা দেয়।

গুলরঙ তড়িৎ-গতিতে ঘুরে দু পা এগিয়ে আসে। চোখে তার আগুন জলে। তার নিজের চুলের বিনুনি ডান হাতে তুলে সামনের দিকে এনে চাবুকের মত সপাং সপাং করে আমার মুখে বুকে গায়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে চালাতে থাকে। দিশেহারা হয়ে দুহাত তুলে আত্মরক্ষার জন্যে দু পা পেছিয়ে যাই। কিন্তু সে উন্মাদ। আমাকে একধারে কোণঠাসা করে আঘাত করতে থাকে।

চিৎকার করে সে বলে,—তুই রাক্ষসী। তুই পিশাচী। তোর হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই। তোর বুকে ছুরি চালালে রক্ত বার হবে না। ঠাণ্ডা জল—হ্যাঁ ঠাণ্ডা বরফ গলা জল ফিন্‌কি দিয়ে বার হবে। তুই—

গুলরঙ আর বলতে পারে না। সে এককোণে মেঝের ওপর বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকে। তার সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে।

আমি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকি। ওকে খুব আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

কতক্ষণ এভাবে কেটে যায় মনে নেই। মুখে বুকে চাবুকের জ্বালা নিয়ে ভাবছিলাম পৃথিবীতে এর চেয়ে সুখ কি আর আছে? ঈশ্বর এত আনন্দও দিতে পারেন আমার মত সামান্য নারীকে।

কখন যে আমরা গলা জড়াজড়ি করে কথাবার্তা সুরু করেছিলাম খেয়াল নেই। আমাদের মুখে হাসিও ফুটে উঠেছিল এক সময়ে।

গুলরঙ বলে,—দারাশুকো যে বাবা হল খবর রাখিস?

—না তো? কবে হল? ছেলে না মেয়ে?

অবাক হয়ে ভাবি, মতলব একথা আমার কাছে গোপন করল কেন?

—ছেলে। আজই তার নাভি থলেতে করে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

—সে আবার কি?

—একটা নিয়ম। হারেমের প্রথা।

—খুলে বলবি ? অদ্ভুত প্রথা মনে হচ্ছে।

—ছেলে বা মেয়ে যেদিন জন্মায় সেদিন বাবার সংগে নবজাতককে ওজন করা হয়। ওজনের কী ঘটা। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবি না। সেদিন অনেকের কপালে ভাল উপহার জোটে। নাচ-গানের ধুম পড়ে যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেদিন হলুদ রঙের সুতো নিয়ে আসেন। সেই সুতোয় একটা করে গিঁট দেওয়া থাকে। এরপর প্রতিবছরে গিঁটের সংখ্যা একটা একটা করে বাড়তে থাকে।

—এইভাবে বয়স বোঝা যায়। তাই না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ওই নাভি ঝুলিয়ে দেওয়াটা কি জিনিস ?

—সেটাও একটা নিয়ম। সুতো দিয়ে নবজাতকের নাভি কেটে, সেই নাভি একটা থলিতে করে তার মাথার বালিশের নীচে রেখে দেওয়া হয়। চল্লিশ দিন পরে সেই থলি গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

—দারাশুকোর ছেলের বয়স চল্লিশ দিন হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ।

মনে হয়, পদাবনতিতে মতলব খাঁয়ের দুঃখের সীমা নেই। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলতে খেয়াল হয়নি তার।

গুলরঙ এবারে সত্যিই চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। আমার দুই গাল, দুহাত দিয়ে চেপে ধরে সে বলে,—তোকে কিছু বলে তো লাভ নেই। তবু বড় দুঃখ হয়। ইচ্ছে করলে কী না হতে পারতিস। কিন্তু চেহারার যা ছিরি হয়েছে কতদিন আর সুযোগ থাকবে জানি না। আয়নায় নিজের মূর্তি দেখিস ?

—হ্যাঁ। বেশ তো লাগে দেখতে। মনে হয় সূর্যের রূপটুকু শুষে নিয়েছি অংগ-প্রত্যংগে।

—আর কয়েক মাস শুষতে থাকলে, পথের মানুষও তোকে যমুনার জলে বিসর্জন দেবে। ভাবিস না, তোর নাচ আর গানের জন্যে লোকের ভীড় হয়।

—তবে ? কেন হয় ?

—সে কথা কি বলে দিতে হবে ? পুরুষদের চিনলি না ? সুল্লা এখনো তোর কথা ভুলতে পারেনি।

একটা পুরোনো ভীতি জেগে ওঠে বুকের মধ্যে। মনে পড়ে যায় দেওয়ান-ই-খাসের কথা। আমার সামনে একটির পর একটি সুগন্ধি রুমাল নাচাতে

চাতে দেহ মনকে অবশ করে তুলেছিল। উঃ, আর কয়েক মুহূর্ত হলে আমার র্বনাশ হয়ে যেত।

—সুজা আজ তোর বন্দী গুলরঙ। আমার কথা মনে হতে দিস না।

—ভয় নেই। মনে হলেও, তোকে দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।

গুলরঙের কথা শেষ হতে না হতেই এক দীর্ঘ পুরুষ প্রবেশ করে রীতিমত ক্ষিপ্র পদক্ষেপে।

দারাশুকো!

আমরা উভয়ে পাশাপাশি প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে থাকি বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। সেই কবে মাথায় আঘাত পেয়েছিলাম আমি সেদিনের পরে বাদশাহ্জাদাকে আর দেখিনি।

—রাণাদিল? কে এসেছে হারেমের শকটে?

—আমার সই।

—নর্তকী?

—হ্যাঁ, বাদশাহ্জাদা।

—কি করে এলো?

—বাদশাহ্জাদা সুজা একে খুবই অনুগ্রহ করেন।

দারাশুকো একবার গুলরঙের দিকে নিমেষে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন, তাও ভালো। আমি ভাবলাম, কোন বাদশাহ্জাদাই বুঝি এসেছেন।

মনে মনে ভাবি, এলেই বা কি হয়েছে? আসতে তো পারেই। আমি নর্তকী। এর জন্যে দারাশুকোর চোখে মুখে এত উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠার কারণ তে পারে না।

মুখে বলি,—আপনি এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন?

—হ্যাঁ, রাণাদিল্।

একটু খোঁটা দেবার লোভ সামলাতে পারি না। বলে ফেলি,—এই অভাবী কদের এলাকাতেও আপনার মত ব্যক্তির পদধূলি পড়ে?

অপ্রতিভকণ্ঠে দারাশুকো বলেন,—আমার কোন বাধানিষেধ নেই। নইলে দিনের মেলাতে যাবার কথা নয়। সেটা মীনাবাজার ছিল না।

—ক্ষমা করবেন বাদশাহ্জাদা। আপনাকে প্রশ্ন করে ধৃষ্টতা প্রকাশ করে ছি। উচিত হয়নি আমার পক্ষে।

ম্লান হাসি ভেসে ওঠে ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখে।

তিনি বলেন,—ধৃষ্টতা নয়। ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু আমি বাদশাহ্জাদা ও মানুষ—একথা ভুলো না।

হাজারবার স্বীকার করি। দারাশুকোর বাক্য একবর্ণ মিথ্যা নয়। সবার ওপর সে মানুষ। এই মানুষটাই তার বাদশাহী কেতা-কানুন ঠাঁট আর কঠোরতাকে মাঝে মাঝে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। নইলে এভাবে আমার গৃহে কখনই প্রবেশ করত না। আজও না—সেদিনও নয়। এও এক নিদারুণ দুর্বলতা। তখ্‌ত্‌তাউসের ভাবী উত্তরাধিকারীর পক্ষে এই দুর্বলতা সর্বনাশা হয়ে উঠতে পারে কোনদিন। তা হোক। এতে আমি খুশী। কারণ ওই দুর্বলতাই মহৎ পুরুষটির হৃদয়ের গভীরতা পরিমাপের সুযোগ এনে দিয়েছে আমার কাছে।

—আমি চলি রাণাদিল্‌।

বসতে বলার মত স্পর্ধা আমার নেই।

বলি,—আবার যদি দেখা দেন কখনো, আনন্দ হবে খুব।

দারাশুকো কী যেন চেয়ে চেয়ে দেখেন আমার চোখের দিকে। বিব্রত বোধ করি। বুঝতে পারি, আমার রোদে পোড়া গালদুটি রক্তিম হয়ে উঠেছে।

—বেশ, চেষ্টা করব।

তেমনি ক্ষিপ্রপদেই বিদায় নেন দারাশুকো।

গুলরঙের মুখে কথা নেই। মুহূর্তের এই ঘটনাপ্রবাহ তাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

মৃদু ধাক্কা দিই,—গুলরঙ।

গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুলরঙ বলে ওঠে,—তাই বল, গোপনে গোপনে এত?

—তার মানে?

—কিছুই জানিস না বলতে চাস?

—না তো? নিজের কানেই তুই শুনলি সব কথা।

গুলরঙ আমার বুকের ওপর হাত রেখে বলে,—আর এখানে? এখানে কোন্‌ কথা হচ্ছে, তা কি শুনতে পাচ্ছি?

—কী, যা তা বলছিস্‌।

—তুই যে মরেছিস, জানিস না বলতে চাস্‌?

হেসে বলি,—নতুন কথা শোনালি। তাহলে হারেমে যেতে পারতাম।

—সেই মরণ নয় রে। এ হল আসল মরণ। তুই কী বোকা।

আমি কোন উত্তর দিতে পারি না।

গুলরঙ আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—আগুন নিয়ে খেলার সাধ তোর পুড়ে মরবি হতভাগী। ওর ওই জিনিসের প্রতিদান ওদের কাছে আশা করিস

ওরা তার কদর বোঝে ?

—আমি কিছুই প্রত্যাশা করি না।

—তবে ? তবে কেন এই সাধ হল ?

মনে মনে বলি, একে সাধ বলে ? এর ওপর কারও কর্তৃত্ব থাকে ?

গুলরঙ আমার কপালের ওপরের ঝুলন্ত কেশগুচ্ছ সরিয়ে দেবার অছিলায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—বড় বিপদে পড়েছিস ভাই। জানি না, তোর ভাগ্যে কি আছে। নর্তকী হতে হলে সবচেয়ে আগে মেয়েলী মনটাকে খুন করে ফেলতে হয় রে।

—আমি পারিনি। পারিনি বলেই হারেমে যেতে চাইনি।

—তবে কেন হারেমের রত্নের ওপর নজর ?

—এটা ইচ্ছাকৃত নয়।

—কিন্তু বাদশাহ্‌জাদার চোখেও যে একই দৃষ্টি দেখলাম। অবাক হচ্ছি। এ-ও কি সম্ভব ? কী জানি। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি আজ চলি। আবার আসব, আসতেই হবে। দারাশুকো কথা দিলে সেই কথার খেলাপ করে না। সে ঠিক আসবে। আমি মাঝে মাঝে না এলে তোর বিপদ হতে পারে।

গুলরঙ চলে যায়।

এরপর কিছুদিন আমি এক বিরাট আবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। সেই আবর্ত থেকে কীভাবে রক্ষা পাব ভেবে দেখার অবকাশ পর্যন্ত পাই না। শুধু দেখতে পাই, আমি ভেসে চলেছি। কোথায় ভেসে চলেছি ? মরণের দিকে ? হ্যাঁ অন্তত তখন আমার সেই রকম মনে হয়েছিল। কারণ যে বিপুল শক্তি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস যদিও বা কিছুটা ছিল, ইচ্ছা একেবারেই ছিল না।

তোমরা তো কেউ-ই পুরুষ নও এই শকটে। যদি পুরুষ হতে কিছু বলতাম না। কারণ আমার সেই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা উপলব্ধি করার মত বোধশক্তি পুরুষের নেই। কোন পুরুষের থাকে বলে জানা নেই। আর তুমি যদি সুজা হও, কিংবা সেই ধরনের অন্য কেউ হও, নারীর এই দুর্বলতা অনুমান করে অতি সহজে তার সর্বনাশ করতে পারে। সুজাকে ভালবাসার নারীর অভাব হতে পারে না। সে রুচিসম্পন্ন যুবা পুরুষ, সুদর্শন ও আকর্ষণীয়! শুধু তার হৃদয়ের গভীরতার অভাব। তার বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হয়ে হৃদয় দিয়ে ফেলতে পারে যে-কোন কমবয়সী রমণী। কারণ কমবয়সে চিন্তা-শক্তি থাকে তরল।

আর তুমি যদি নারী হও—এই শকটের তোমরা সবাই তো নারী—তোমাদের কিছুই বলে দিতে হবে না। ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছ। তোমাদে কারও জীবনে কি এমন ঘটেনি? যার সঙ্গে তোমার সাদি হয়েছে সেই-কি তোমার জীবনের আসল পুরুষটি, মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে বসে আছো যার কাছে? যদি বল হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের মত একশোজন নারীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করব। তোমরা সবাই যদি বলে ওঠো হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে চেঁচিয়ে উঠব নানা—না, মিথ্যে। বড় জোর একশোজনের মধ্যে পাঁচজন একথা বললেও বলতে পারে। বাকী সব-ঝুট্। সমাজ আর সংসারকে ধরে রাখার জন্যে তোমরা একথা বলতে বাধ্য হচ্ছ। আহা, তোমাদের জন্যে কষ্ট হয়। তোমরা বড় ভীতু ভয় পাও, পাছে বিরাট একটা ওলট-পালট হয়ে যায়। তোমাদের একশোজনের মধ্যে অধিকাংশ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রতিষ্ঠা তোমাদের হৃদয়কে কোণঠাসা করে রেখেছে। তোমাদের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। স্ত্রী জাতির এ-ও একধরনের মরণ। নিশ্চিত আশ্রয় আর নিরাপত্তার কাছে তার হৃদয়কে পদদলিত করে। এর সংগে প্রতিষ্ঠা থাকলে তো কথাই নেই। কী দৈন্য। নারী হয়ে আমার এতে লজ্জার সীমা নেই।

কিন্তু এত সত্বেও সেই আসল মানুষটি যদি এসে উপস্থিত হয় তোমার সামনে কোন নিভৃত স্থানে? তোমার মনের অবস্থা কি হবে—যে মন বুভুক্ষু হয়ে রয়েছে? আর সেই পুরুষ যদি তোমাকেই দাবী করে বসে? কী করবে? সাময়িক আত্মসমর্পণ? কোন রকম বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে হয়ত তাই। পুরুষেরা বড় স্থূল—তাই তো? অর্থাৎ তারা সূক্ষ্মতার ধার ধারে না। এ শুধু মুখের কথা। মন আবার ওই স্থূলতা আর আপাত-কর্কশতাই পছন্দ করে বলে শুনি। সত্যি নাকি? মাথা নীচ করছ কেন?

ওসব কথা থাক। তোমাদের জ্ঞান দেবার স্পর্ধা আমার নেই। নিজের কথাতেই ফিরে আসি। আমি নর্তকী। অবিবাহিতা। আমি নিরাশ্রয়া। শেষ আশ্রয় যিনি ছিলেন তিনি আজ গত। আমি দারাশুকোকে মন দিয়ে ফেলেছি। সেই দারা যদি বারবার আমার কাছে আসে, তার চোখে যদি এমন দৃষ্টি ফুটে ওঠে যার অর্থ ভালবাসা এবং আরও কিছু, তাহলে কি আমি নিজেকে সংযত করে রাখব? তোমরাই জবাব দাও আমার হয়ে।

আমি চেষ্টা করছি। মুহুর্মুহুঃ নিজেকে অঞ্জলি দেবার অদম্য প্রলোভন থেকে সংযত থেকেছি, যা তোমাদের মত নারীর পক্ষে দুঃসাধ্য। হলফ করেই

একথা বলতে পারি আজ।

অথচ আমি সাধারণ এক নর্তকী। নৃত্য ও সংগীত আমার পেশা। অন্যান্য নর্তকীদের মত আমারও উচিত দেহটিকে অনাঘ্রাত রাখার চেষ্টা না করা। তাতে আর্থিক ক্ষতি। নর্তকীরা নিছক নর্তকী হয়ে থাকতে পারে না অধিকাংশ সময়ে। গুলরঙই তার বড় প্রমাণ। সে ছাড়াও যাদের আমি মোটামুটিভাবে চিনি তাদের মধ্যে রয়েছে জালিয়াবাঈ, আকাশবাঈ, গুনালবাঈ, মুরাদবাঈ—আরও কত নাম করব? এরা সব রাজধানীর ওমরাহ্; রাজা উজীর আর নবাবদের বড় আকর্ষণ। এদের গৃহে রাতে জলসা বসে। সেই জলসা যখনি শেষ হোক না কেন, পরদিন দুপুরের আগে পর্যন্ত ওদের অতিথিদের নিদ্রাভংগ হয় না।

আমিও নর্তকী। তবু স্বয়ং ভাবী বাদশাহ্‌র আকর্ষণ ঠেকিয়ে রেখেছি। তার পূর্ণ চাহিদা মেটাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সামলে রেখেছি।

কিন্তু আর কি পারব? যমুনায় বজরা সজ্জিত রয়েছে। আমার গৃহদ্বারে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই শকট এসে অপেক্ষা করে আছে। বজরায় দারা রয়েছে। তার অনুরোধ এসে পৌঁছেচে আমার কাছে।

এতটা কল্পনা করতে পারিনি। এই সময় গুলরঙ এলে বড় ভাল হত। সে কতদিন এলো অথচ দারা এলো না। আজ সে আসেনি। এলে বুদ্ধি দিতে পারত। নিষ্ঠুর হাতে আমাকে ধরে রাখতে পারত সে। কারণ আমার মন অনেক আগেই বজরায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আমার দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণু চঞ্চল হয়ে ছুটে যেতে চাইছে।

আর পারি না। সারাদিনের পথ-শ্রান্ত দেহখানাকে সম্ভব মত সাজিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শকটে আরোহণ করি। সেটি যাত্রা শুরু করে। আমার শেষ অবরোধ ধূলিসাৎ হল। পিতাজী! একি তোমার অভিশাপ না আশীর্বাদ?

তীর থেকে দারা আমার হাত ধরে বজরায় তুলে নেয়। বজরা হেলতে দুলতে মাঝ দরিয়ায় যেতে শুরু করে। আমার ভাগ্যও মাঝ-দরিয়ায়। উভয় দিকের কূলই বেশ দূরে।

দারা আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত।

হঠাৎ সে নীচু হয়ে আমার মুখ দেখার চেষ্টা করে বলে,—তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন রাণাদিল্? কেমন ভিজে ভিজে। কেন?

—ভয়ে বাদশাহ্‌জাদা।

—আমার ভয়?

—হ্যাঁ।

—আর একদিন একথা বলেছিলে।

—হঁ্যা।

—চল, তোমাকে নামিয়ে দিই। আমি এমনটি চাইনি।

এবারে দারার ডানহাত চেপে ধরে বলি,—না।

—কেন? এও কি ভয়ে?

—না।

—তবে?

—জানি না।

—কিন্তু এভাবে কেন তুমি বন্দিনী হয়ে থাকবে কষ্ট করে?

অনেক কষ্টে উচ্চারণ করি,—ভাল লাগে।

—ভাল লাগে? কী বলছ তুমি রাণাদিল্? ভয়—ভাল লাগে—কোন্‌টা সত্যি?

—ছুটোই।

দারা হেসে ফেলে। তার মৃদু হাসির শব্দ যমুনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউয়ের ভেঙে যাওয়ার শব্দের মত কানে অনুরণিত হতে থাকে।

সে বলে,—ছুটোই?

—হঁ্যা।

—বেশ। মেনে নিলাম। কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌টা বেশী সত্যি?

—ছুটোই।

—আশ্চর্য!

—না বাদশাহ্‌জাদা।

—আশ্চর্য নয়?

—না।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু তোমার হাত যদি ঠাণ্ডা থাকে, তাহলে আমি চুপচাপ বসে থাকব। কথাও বলব না।

—ঠাণ্ডা নেই।

—নেই?

—না।

—তুমি বলতে চাও তোমার হাত গরম হয়ে গিয়েছে?

—হঁ্যা।

—দেখি? আরে, সত্যই তো।

আমি লজ্জিত হই। কথা বলতে পারি না। কী বলব!

—তোমার ভয় কেটে গিয়েছে রাণাদিল্?

এবারে কিছুটা সহজ হয়ে বলি,—আমার ভাল লাগাতেও ভয়, খারাপ লাগাতেও ভয় বাদশাহ্জাদা।

—তাই বুঝি? সুন্দর। বেশ নতুন কথা বলেছ। ভেতরে গিয়ে বলবে?

—চলুন বাদশাহ্জাদা।

—এতবার বাদশাহ্জাদা বোলো না। ছন্দপতন হয়। কানে বাজে বড্ড বেশী।

—আপনার যা অভিরুচি।

দারা হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায় আমাকে। কী অপূর্ব শিল্পকার্য যে ভেতরে দেখলে মনে হয় কোন মায়াপুরীতে এসে প্রবেশ করেছি। চিরাগ দানির কী বাহার! সুন্দর সব জরির কাজ করা পর্দা হাওয়ায় ধীরে ধীরে দুলছে! সোনার জরি। রূপোর জরি।

মাঝখানে সুন্দর আরামদায়ক আসন।

—এখানে বোসো রাণাদিল্।

আমার পা কেঁপে ওঠে। দুপাশে দুটো তাকিয়া। আতরের সুগন্ধ। বিচিত্র সব ফুলের বাহার। এত রঙের ফুলও ফোটে দুনিয়ায়।

মনটা আপনা হতে ভরে ওঠে। দারার মুখ সুজার মুখ নয়, চোখ সুজার চোখ নয়। ওই চোখে সেই জ্বালধরা বিষাক্ত শিখা নেই যা দেহকে পুড়িয়ে দিতে চায়।

—বাদশাহ্জাদা।

—আবার বাদশাহ্জাদা রাণাদিল্?

—কী বলে ডাকব তবে?

—কী হবে ডেকে? না ডেকেও কি কথা বলা যায় না?

যায় না আবার। কিন্তু আসল মানুষটি যখন সামনে, তখন একটা কিছু বলে ডাকতে হয় যে। অন্তত ওই কণ্ঠস্বর শুনতে হলেও যে কিছু বলতে হয়।

—না ডেকে কিভাবে কথা বলব?

—বেশ। শুধু দারা বল তবে।

—সেকি! আমি সামান্য—

দারাশুকো আমার মুখ চেপে ধরে। তোমরা হয়ত লক্ষ্য করেছ আমি তার সম্বন্ধে আর দূরের মানুষের সম্মান দিয়ে বলছি না। বজরার আমন্ত্রণে মনের দূরত্বটুকু আপনা থেকে ঘুচে গিয়েছে।

দারা আমার মুখ ছেড়ে দিয়ে বলে—শোন রাণাদিল্, তুমি ছাড়া আমার উপায় নেই।

বজরা দুলছে। দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ যমুনার কালো রাতের অন্ধকারে মসীলিপ্ত।

আমার হৃদয়েও বজরার দোলন। সেই দোলন আরও প্রবল। কী জবাব দেব এই কথার? নারী হয়ে কি বলা যায় যে তুমি ছাড়া আমারও যে অস্তিত্ব নেই? না। সেকথা মুখ ফুটে বার হবার আগে মরণ ভাল। কী বলব তবে?

—কেন দারা, নাদিরা বেগম? পুরোনো হয়ে গেলেন? সন্তানের জননী হয়েই?

—না!

—তবে?

—নাদিরাকে আমি ভালবাসি।

ও। বুঝেছি। এখানেও সেই একই জিনিস। নাদিরাকে সে ভালবাসে, আর সময় বিশেষে আমার দেহটাকে সে ভাল লাগাতে চায়। দারাশুকোও নতুন কিছু নয়। শুনেছি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে ইতিমধ্যেই তার অগাধ পাণ্ডিত্য। শুনেছি সে দার্শনিক। কিন্তু ওসব হল তার বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপার। আসল রক্তমাংসের মানুষটি হল পুরুষ—যে পুরুষ আবহমান কাল থেকে বৈচিত্র্যলোভী। ভ্রমর-বৃত্তি। এতেই নাকি ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একথা যারা লিখেছে তারাও নিশ্চয় পুরুষ। কোন নারী তেমন লিখেছে বলে শুনিনি। লিখলে শুনতে পেতাম হয়ত। পুরুষেরা সব কিছুর মধ্যেই নিজেদের সুবিধাটুকু করে নিয়েছে। আর সংস্কারগুলো চাপিয়ে দিয়েছে নারীদের ওপর—যাতে তারা পর্দার অন্তরালে বিশ্বস্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। যাতে তাদের মনও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে ভয় পায়। মুসলমান রমণীর মত হিন্দু রমণীর পর্দা আর বোরখা হল ফাঁকা আদর্শের বড় বড় বুলি। একই কথা।

যদি পারতাম, তবে বলতাম—হে পুরুষ জাতি! আমাদের তোমরা যা ভাব আমরা মোটেই তা নই। শুধু দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে আমরা তোমাদের মত সোজা পথে চলতে পারি না, উদ্ধত হতে পারি না। আমাদের একটু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যুগ যুগ ধরে তোমাদের জুলুম আর নির্দয়তা আমাদের অভিনয়ে রপ্ত করে তুলেছে। তাই আমাদের মন আর মুখ কখনো এক হতে পারে না। যদি আমাদের মনকে উন্মীলিত করে দেখার সামর্থ তোমাদের থাকত তাহলে বুঝতে সবাই আমরা দিবারাত্রি অভিনয় করে চলেছি তোমাদের তুষ্ট করার জন্য। এছাড়া গতি নেই। একটা নিরাপদ আশ্রয়ের যে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা ঈশ্বর তোমাদের দেননি। তাই তোমাদের বুকে বুক রেখে, মুখে মুখ

রেখে অন্যের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকার আমাদের অবাধ ইচ্ছাকে সংযত করার সাধ্য কখনো তোমাদের হবে না।

দূর থেকে কোন মাঝির কণ্ঠসংগীত ভেসে আসে। ভাঙা গলার উদাস সুর। আমার মনটিও উদাস হয়ে যায় দারার কথায়।

—চুপ করে আছো কেন রাণাদিল্? অসুবিধা হচ্ছে?

—না।

—তবে?

—ভাবছি নাদিরা বেগম ভাগ্যবতী।

—কিংবা আমি ভাগ্যবান।

—তাও ঠিক।

—কিন্তু নাদিরার কথা থাক এখন।

—কেন? যাকে ভালবাসা যায়, তার কথাতেই নাকি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাওয়া যায় বলে শুনি।

—কিন্তু আমি তোমায় এনেছি নাদিরার কথা বলার জন্যে নয়।

—নাচ দেখতে? গান শুনতে বুঝি?

—তোমার নাচ, তোমার গান আমায় সত্যিই মুগ্ধ করে। তুমি জান না, কতদিন ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুনেছি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, রাণাদিল্। তুমি জান না কতদিন তোমার কুটিরের পাশ দিয়ে গিয়েছি। একা একা অপেক্ষা করেছি।

—আপনি বলছেন কি দারাশুকো!

—আমাকে অন্তত মিথ্যাবাদী ভেবো না।

—না না। কখনই না। কিন্তু কেন? কেন আপনার এই অনুগ্রহ?

—অনুগ্রহ? বল আগ্রহ। আর তোমার প্রশ্নের জবাব তুমিই জান।

—জানি না। শুধু সংগীতের আকর্ষণে এমন হতে পারে?

—না।

—তবে?

—তোমার আকর্ষণে।

—আমার আগের সেই রঙ নেই। আমার দৈহিক সুষমা হারেমের সবচেয়ে কুরূপা রমণীর মতও নয়।

—অতশত বুঝি না। তোমার আকর্ষণ আমার কাছে দুর্নিবার। এই আকর্ষণের পেছনে কোন্ কারণ রয়েছে, অনেক ভেবেও ধরতে পারি নি।

ওড়নার আড়ালে হাতদুটো দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না। না সামলালে চলবে না। দারার কাহিনীর ভেতরে এক ফোঁটা কলুষতা নেই। কিংবা সেই চোখে স্বর্গীয় কোন নির্লিপ্ততাও মাখানো নেই।

প্রশ্ন করি,—এই আকর্ষণকে এক কথায় প্রকাশ করার মত কোন কিছু আছে কি বাদশাহ্‌জাদা?

—হ্যাঁ, তাও ভেবে দেখেছি।

—কী সেই কথা!

—ভালবাসা।

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। এই ছোট্ট কথাটুকু শোনার জন্যে উদার পুরুষটিকে এতক্ষণ ধরে নির্লজ্জের মত চাপা দিয়ে চলেছিলাম। এবারে কি করব? আত্মসমর্পণ? মনেপ্রাণে কবেই আত্মসমর্পণ করে আছি। কিন্তু পুরুষেরা যেভাবে চায় তা যে অসম্ভব।

চঞ্চল হয়ে উঠি। আসন ছেড়ে উঠে দুচার পা এগিয়ে গিয়ে পর্দা তুলে দিই। হু হু করে যমুনার শীতল হাওয়া প্রবেশ করে।

—তোমাকে আমি অপমানিত করতে চাইনি রাণাদিল্।

—জানি। আমি জানি দারা।

—তুমি উঠলে কেন?

নিষ্ঠুরের মত বলি,—কোন্ ভালবাসা সাচ্চা দারা? নাদিরার প্রতি? না, আমার প্রতি?

মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয় শাহানশাহ্ শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র—হিন্দুস্থানের তখ্‌ত তাউসের ভাবী উত্তরাধিকারী। তারপর অত্যন্ত দৃঢস্বরে বলে,—দুটোই।

—সেকি! ভালবাসাকে ভাগ করা যায়?

—যায়।

আমি হেসে উঠি। বড় দুঃখ হয়। দারাকে আমি অবিশ্বাস করি না। সে প্রতারক নয়। কিন্তু তার উপলব্ধির ভেতরে কোথাও গলদ রয়েছে। অথবা সে নাদিরাকে ভালবাসে না। নাদিরার প্রতি তার রয়েছে শুধু অপরিসীম দরদ বা অনুকম্পা। একেই ভালবাসা বলে ভুল করেছে। কিংবা এমনও হতে পারে আমার প্রতি দেহগত মোহকে ভালবাসা ভেবে বসে আছে। নবাব বাদশাহ্‌দের উপাদেয় খাদ্য বস্তুতে মাঝে মাঝে অরুচি দেখা যায়। তখন গরীবদের খাদ্যে আগ্রহ জন্মায়। এও একধরনের সখ। একঘেঁয়েমী থেকে মুখবদল।

—তুমি হাসলে রাণাদিল্ ?

দারার বেদনা-ভরা উক্তিতে দুঃখ পাই।

বলি,—ইচ্ছে করে হাসিনি বাদশাহ্‌জাদা। হাসি পেল।

—কেন ?

—ভালবাসাকে ভাগ করা যায় শুনে।

—আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেব ?

—বেশ তো।

—ধর, কোন মায়ের দুটি সন্তান। তাঁর মাতৃস্নেহ কি একটির ওপরই বর্ষিত হয় ? অন্য সন্তান বঞ্চিত হয় ?

দারার এই যুক্তিপূর্ণ কথার সত্যিই কোন জবাব খুঁজে পাই না। অথচ মনে মনে জানি ব্যাপারটা ঠিক এক নয়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলে,—জবাব দাও।

—দুটোকে আমি এক বলে ভাবতে পারছি না। নারীরা কখনই পারে না।

—মনে কর, পুরুষেরা পারে।

—তাহলে বুঝব পুরুষের ভালবাসায় বিন্দুমাত্র গভীরতা নেই।

—হতে পারে। তার জন্যে পুরুষেরা দায়ী নয়। আমি তোমাদের দুজনকে ভালবাসি। নাদিরা আমাকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করে। তোমার আকর্ষণও ঠিক একই রকম। আমার সাদির দিনে তোমায় যখন প্রথম দেখলাম, তখন অন্তরে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তখনি বুঝে ছিলাম নাদিরা একা নয়—

বজরা কোথায় চলেছে জানি না। রাত গভীর হতে থাকে। আজ রাতে ঘরে ফিরব কি ? না ফিরলেও ক্ষতি নেই। সম্মুখের মানুষটি প্রকৃত পুরুষ। তার আশ্রয় নির্ভরযোগ্য। তার উষ্ণতা আমার অতি প্রিয়। সে আমায় কতটা ভালবাসে জানি না, আদৌ বাসে কিনা তাও জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, তার দৃঢ় বিশ্বাস সে আমায় ভালবাসে। তা যদি না হত তাহলে এতক্ষণ এই অতুলনীয় সংযম নিয়ে আমার সংগে কথা বলত না। আমি নারী হয়েও উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। এই পুরুষকে আরও কাছে পেতে চাইছি—নিবিড় ভাবে পেতে চাইছি। শুধু নারী বলেই নিজের থেকে এগিয়ে যেতে পারছি না।

—রাণাদিল্।

—বল।

একি ! মুখ ফস্‌কে এ-ধরনের সম্বোধন বার হল কেন ? আমি কি উন্মাদিনী হলাম ? এই কথার অর্থ পৃথিবীর সবচেয়ে মূর্খ পুরুষও যে বুঝতে পারে !

দারা উঠে এসে আমাকে বুকে টেনে নেয়। আমি পরিণত হই দুই কূল

প্লাবিত করা বাঁধভাঙা নদীতে। আমি সাগরে মিশতে চাই। না মিশলে শান্তি পাব না।

—তুমিও রাণাদিল্?

—হ্যাঁ দারা, আমিও।

—কবে থেকে?

—গ্রাম দর্শনের ক্ষণ থেকে।

—ওঃ, কী শান্তি।

যমুনায় কি উজান বইছে? জানি না। আকাশে কি চাঁদ রয়েছে? জানি না। বাইরে প্রকৃতি কি-শান্ত শ্রী নিয়ে বিরাজ করছে? বলতে পারি না। ঝড় উঠেছে কি? কে জানে? আমি কোথায়? স্বর্গে না মর্তে? অত হিসাব করার মত অবস্থা আমার থাকে না। আমার দেহ মন এক অপূর্ব ছন্দে দোলায়িত হতে থাকে। এই ছন্দের মূর্ছনাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ ছন্দ চিত্তের এক অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির কিছুটা ধারণা করতে পারে মাত্র।

এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ আমাকে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। কোথায়? জানি না। কারণ এমন কখনো ঘটেনি আমার জীবনে।

একটা সুর অনুরঞ্জিত হতে থাকে অবিরত। কী সেই সুর? ওস্তাদজী এরকম সুরের সন্ধান তো কখনো দেননি। না না। এতো দারার মধুর কণ্ঠস্বর। সে আমায় কী যেন বলে চলেছে। কী বলে চলেছে? প্রয়োজন নেই শোনার। না শুনেও বুঝতে পারি। ভাষার মাধ্যমে বুঝতে যেটুকু অসুবিধা হয়, তাও হচ্ছে না।

কতশত মুহূর্ত পার হয়ে গেল। শেষে একসময়ে দেখি দারা আমাকে তুলে নিয়েছে বুকের ওপর। সে আমার মুখের সামনে মুখ এনে, চোখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছে। চোখ বন্ধ করি।

আর তখনি বুঝতে পারি আমি আর আগের রাণাদিল্ নেই। আমি হেরে গিয়েছি। আমার সব অহমিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভোরের অনাঘ্রাত কুসুম বলে নিজেকে আর ভাবতে পারব না। আমি এক অতি সাধারণ নারী—নরের সাহচর্য ছাড়া যে নারী পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি কেঁদে উঠি। আকুল ভাবে কেঁদে উঠি। নয়নে এত অশ্রু থাকতে পারে জানা ছিল না। দারার আদর আর সোহাগ সেই বারিধারাকে রুদ্ধ করতে পারে না।

আমি পরাজিত। এ আমি চাইনি। আমার অন্তর ব্যাকুল ভাবে চাইলেও আমি চাইনি। এ আমার কী হল? এখনো আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই।

রগ্নিতে ঘৃতাহুতির ফলে আরও প্রজ্জলিত। নিরালায় প্রস্ফুটিত একটি গুলাব প্রথম ভ্রমরের স্পর্শের স্বাদ পেয়ে যেন উন্মাদিনী। আমি কি করব ঈশ্বর!

—রাণাদিল্। কেঁদো না। আমি অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি।

—না।

—আমি অপরাধী।

—না।

—তবে?

—তোমার দোষ নেই। আমার—

—না, আমি দোষী।

—না দারা, না। আমি—

—কেঁদো না।

—পারছি না। না কেঁদে পারছি না।

—বেশ, আর কখনো আমায় দেখবে না তুমি।

—না। কিন্তু কী হবে?

—বিশ্বাস কর, আমি ছলনা করিনি।

—জানি। কিন্তু কী হবে?

—তুমি যদি আমায় ভালবাস, তবে এ প্রশ্ন ওঠে কেন রাণাদিল্?

—আমি উপপত্নী হতে চাই না। অথচ তোমাকে না হলে আমি বাঁচতে পারব না। আমি মরব দারা।

—না।

—আমার বেঁচে থাকবার উপায় নেই। তুমি আমাকে যমুনার জলে ফেলে দাও। সাঁতার জানি না।

—কিন্তু আমি? আমি তাহলে বাঁচব কিভাবে?

—তোমার নাদিরা আছে।

—রাণাদিল্কেও আমার প্রয়োজন।

—আমার মৃত্যু হলে রাণাদিলকে ভুলে যেতে পারবে দারা।

দৃঢ়কণ্ঠে দারা বলে,—না। কখনো ভুলতে পারব না।

—তাহলে?

—তোমায় বাঁচতে হবে।

—উপপত্নী হয়ে?

—এই একবারের মিলনেই আমি বুঝেছি, তুমি ছাড়া আমার উপায় নেই। যভাবেই হোক তোমাকে বাঁচতে হবে।

—সম্ভব নয়।

—বেগম হও যদি ?

হাসি পায়। তবু হাসি না। বুঝতে পারি দারার এই মন্তব্য স্থির মস্তিষ্কের নয়। কারণ কোন নর্তকী কখনো মুঘল বংশের বেগম হয়নি। হবেও না।

মুখে বলি,—সম্ভব হলে, সেটাই একমাত্র পথ হতে পারত।

দারা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে। শেষে বলে,—দেখি।

সেই রাত বজরাতেই কেটে গেল। এক স্বর্গীয় সুখস্বপ্নের মধ্যে বড় তাড়াতাড়ি ভোরের পাখীরা ডেকে উঠল। স্বপ্ন ছুটে গেল। জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখা যায়। দারার মুখে আমার চোখের কাজল। তার কামিজে আমার ঘাগরার চুমকী। আর আমার মুখে ? জানি না। দেখতে পাইনি। দারা দেখে থাকবে। নইলে—বজরা ছেড়ে নেমে যাবার আগের মুহূর্তে ওভাবে আমার মুখ মুছিয়ে দিল কেন ? ওতে তো আমার মুখের মৃদু জালা জুড়িয়ে গেল না।

শকট আমার গৃহদ্বারে এসে থামল। সূর্য উঠতে এখনো কয়েক দণ্ড বাকী। পাশের শিমুল গাছের আড়ালে কে যেন লুকিয়ে পড়ল আমায় দেখে।

শকট চলে যেতে ধীরে ধীরে আমি সেদিকে এগিয়ে যাই। মানুষটি গাছের আড়াল থেকে বার হয়ে ক্ষিপ্রপদে রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করে।

—আবদুল্লা ?

সে সাড়া দিল না।

—আবদুল্লা !

সে থামল। পেছনে ফিরল। কিন্তু এগিয়ে এল না।

—শুনে যাও আবদুল্লা।

সে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়।

—এত ভোরে তুমি এখানে কি করছিলে আবদুল্লা ?

—পাহারা দিচ্ছিলাম।

—কাকে ?

—ভেবেছিলাম এই বাড়ীর মানুষটি ভেতরে আছে। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করনি। তাই ভুল হয়েছিল ! অভিসারের সময়ে এতটা উন্মত্ত হতে নেই রাণাদিল্। বাদশাহ্জাদার জন্যেও নয়।

—তুমি পাহারা দাও আমাকে ?

—দিতাম। আর দেবো না।

আবদুল্লা হন্ হন্ করে চলতে শুরু করে। আমার কাতর অনুরোধেও তাকে আর ফেরাতে পারি না। আবদুল্লাসমেত সমস্ত সাধারণ মানুষ থেকে আমি

একটি রাতের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

দারা আমায় যেমন ভালবাসে আবদুল্লার ভালবাসা তেমন নয়। বজরার মধ্যে দারা একটিবারের জন্যেও নাচ দেখতে চায় নি, গান শুনতে চায় নি। সে আমায় চেয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লা? রাতের পর রাত আমার অজ্ঞাতে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্যে পাহারা দিয়ে চলেছিল কেন? রক্ত মাংসের রাণাদিলের জন্যে কখনই নয়। নর্তকী রাণাদিল্, সংগীতজ্ঞ রাণাদিলের জন্যে।

কোন্‌টি স্বর্গীয়? বজরার একরাতের অপরিতৃপ্ত সুখ? না, আমার নৃত্যের ছন্দ আর সুরেলা কণ্ঠস্বর? জবাব দেবার মত দুঃসাহস আমার নেই। তাহলে মানবী রাণাদিল্ শিল্পী রাণাদিল্‌কে খুন করে বসবে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। দারার তরফ থেকে কোন সাড়া নেই। অর্থাৎ মোহমত্ত মস্তিষ্ক আমাকে বেগম করার যে আশ্বাস দিয়েছিল, সেদিনের সারা রাতের অনিদ্রা শেষে, হারেমের সুকোমল পালংকে দিবস নিদ্রার পর সেই আশ্বাস তার নিজের কাছেই অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল নিশ্চয়। তাই দারা আমার কাছে আসা কিছুদিন বন্ধ রেখেছে। কিন্তু সে আসবে। আমি জানি সে আসবে। কারণ আমার দুর্বলতার কথা তার জানা হয়ে গিয়েছে। সেদিন সরল ভাবে আমি নিজের দেহের মত মনও উন্মোচিত করে দিয়েছিলাম। তাই সে না এসে পারবে না। সে যদি দারা না হয়ে অন্য কোন নবাব বা বাদশাহ্ বা রাজা হত, এতদিনে বহুবার আসত। দারা বলেই আসতে সংকোচ বোধ করছে। তার মন অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন। তার হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মতা ঐশ্বর্যের ঘর্ষণে সমান হয়ে যায় নি।

কিন্তু আমাকে আর সে দেখতে পাবে না। একদিনের স্খলনের জন্য আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু দুই বা তিনদিনের স্খলনের অর্থই হল দারার উপপত্নীত্ব স্বীকার করে নেওয়া। তা অসম্ভব।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই। কীভাবে মৃত্যুকে বরণ করব এই চিন্তায় দিনের পর দিন কেটে যায়। আমার নাচ বন্ধ হয়েছে, গান বন্ধ হয়েছে। পথিকরা তাদের রাণাদিল্‌কে আর পথের মাঝে আসর জমিয়ে তুলতে দেখে না। আবদুল্লার কাছে ইতিমধ্যেই তারা বোধহয় জেনে ফেলেছে রাণাদিলের প্রকারান্তরে মৃত্যু ঘটেছে। হতাশ বোধ করেছে তারা। বিদ্রূপের হাসিও কি হাসেনি কেউ?

তারা জানে না রাণাদিল্ সত্যিই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবনে দিনের পর দিন তার মস্তিষ্ক চিন্তাভারাক্রান্ত। গৃহে

খাদ্যাভাব। একদিন পরেই অনাহার ছাড়া গতি নেই। তবু বাইরে যাই না। মরতে যখন হবেই, দুদিন না খেলে এসে যায় না কিছু।

কীভাবে মরব? বলে দিতে পারে কেউ? সাঁতার না জানলেও যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে মরার ইচ্ছা আমার নেই। দেহটা ফুলে ফেঁপে ভেসে উঠবে। বড় বিশ্রী দেখাবে। আগুনে পুড়ে? অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যায় শুনেছি বড় কষ্ট। তবে?

সহসা একদিন মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ এনায়েতের কথা। নিরাশার অন্ধকারে আলোকবর্তিকা যেন এই এনায়েত। হ্যাঁ, সে-ই পারে। বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। কয়েক পলকের মধ্যে শরীরে নেমে আসবে মৃত্যুর শীতলতা। দারার শতকোটি সোহাগেও সেই শীতলতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না।

হ্যাঁ এনায়েত। সাপুড়ে এনায়েত। তার ঝাঁপির ভেতরে যে সমস্ত বিষধর সাপ দিবারাত্র ফোঁস ফোঁস করে তাদেরই বিষদাঁত ভেঙে ভেঙে নিয়ে এনায়েত ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। এই বিষ সে দেয় হাকিমদের। দাবাই প্রস্তুত হয়। তাছাড়া, চোখদুটো একটু কুঁচকে বলিরেখা লাঞ্ছিত মুখে হাসি ফুটিয়ে এনায়েত বলেছিল—কত মানুষ পৃথিবীতে শুধু যন্ত্রণাই ভোগ করে যায়। রোগের যন্ত্রণা, মহব্বৎ-এর যন্ত্রণা—আরও কত কি। সেই যন্ত্রণার আশান্ ঘটাতে তারা কত এসেছে চুপি চুপি। মুক্তি চেয়ে নিয়েছে এনায়েতের কাছে।

এই কথা বলার সময় সহসা এনায়েতের চোখের দুকূল ছাপিয়ে অশ্রু ঝরে পড়েছিল। কারণ শেষ পর্যন্ত এই মহব্বৎ-এর যন্ত্রণা তার নিজের কন্যা সায়ীদাই সইতে পারল না। না পেরে পিতার বিষ ভাণ্ডার থেকে গরল চুরি করেছিল। ফলও ফলেছিল অত্যন্ত দ্রুত। কন্যার সংগে গোপনে বেশ কিছুদিন খেলা করে সেই বিশ্বাসঘাতক পুরুষটি আর একজনকে সংগিনী করে নিয়ে পালিয়ে গেল সেই কান্দাহারে। তাই এখন এনায়েত ওসবের মধ্যে নেই।

তবু এনায়েতকে কাকুতি-মিনতি করলে সে আমাকে মুক্তির দাবাই দিতে পারে। আমি আত্মসম্মান নিয়ে পৃথিবীকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিতে পারি।

রাতের অন্ধকারে একদিন ঘরের বাইরে বার হয়ে পড়ি। কৃষ্ণপক্ষ। কোথাও কোন আলোর চিহ্নমাত্র নেই। এই দরিদ্রের পল্লীতে আলো জিনিসটার একান্ত অভাব। এখানে ঘরে আলো নেই, জীবনে আলো নেই, মনে আলো নেই।

ঘরের কপাট বাইরে থেকে বন্ধ করি। না করলেও চলত। আবদুল্লা আর পাহারা দেয় না। সে চলে গিয়েছে। দরজা হাট করে খুলে রেখে গেলেও সে উঁকি দিতে আসবে না। সে ফিরবে না বলেই চলে গিয়েছে। কিন্নার

হাতছানিতে আমার মন ভুলেছে দেখে সে বিদায় নিয়েছে। আমি এখন আর ওদের রাণাদিল্ নই।

ওড়নার ঘোমটা লম্বা করে টেনে দিই। রাত-জাগা অনেক মানুষ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় নগরীর পথে-প্রান্তরে। উদ্দেশ্য তাদের বিভিন্ন হলেও নর্তকী রাণাদিল্‌কে চিনতে কারও ভুল হবে না।

আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল্ করছে। ওরা কি আমায় ডাকছে? ওদের মুখে দুষ্টুমির হাসি! ওরা দুষ্ট অথচ কেমন যেন অসহায়। সেই অসহায়তার কথা ওরা বোঝে না। ঠিক যেন, মাতৃহারা শিশু ওরা। স্তন্যদান করে রেখে মা ওদের চিরকালের মত চলে গিয়েছে। মাতৃদুগ্ধ যতক্ষণ জঠরে রয়েছে ততক্ষণই ওদের আনন্দ। তারপর ক্ষুধার তাড়নায় সবাই একসংগে কাঁদতে স্বরু করবে। ভাবতেই মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। ওই কোটি কোটি শিশু কণ্ঠের ক্রন্দনে মুখরিত আকাশ নিয়ে পৃথিবী কী করবে? তার অবস্থা কেমন হবে? উঃ ভাবা যায় না।

আমার কান্না পেল। কেন কান্না পেল বলতে পারি না। কোন কারণ নেই। কিন্তু আমার বুকের ভেতর থেকে কান্না ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে। মাটির ওপর বসে পড়ে সেই কান্নার বেগ প্রানপণে চাপতে চেষ্টা করি। কারণ দেরী করা চলবে না। এনায়েতের কাছে যেতেই হবে।

দুহাতে বুক চেপে ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াই।

—রাণাদিল্।

—কে?

আর্তনাদ করে উঠি। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে মানুষটি। অন্ধকারে চেনা যায় না।

—আমি আবদুল্লা।

—ও আবদুল্লা। কেন এসেছ আবার? তোমরা তো আমাকে চাও না। তবে কেন আমার ঘরের কাছে সময়ে অসময়ে ঘুরঘুর কর। দূর হও। তোমাদের কাউকে আমার প্রয়োজন নেই।

—শকট না এলে, এভাবে যেও না কখনো। দিনের নগরী তোমার চেনা হলেও রাতের নগরী সম্বন্ধে ধারণা নেই।

—না থাক। তুমি চলে যাও। কেন এসেছ আমাকে কষ্ট দিতে? কী অধিকার আছে তোমার?

—অধিকার? না। অধিকার তো নেই। বাধাও দেব না। শুধু সাবধান করে দিলাম।

রাগে দুঃখে আমার উষ্ণ মস্তিষ্ক আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উন্মাদিনীর

মত আমি আবদুল্লার একটি হাত ধরে দংশন করি।

সে শান্ত, অবিচল। হাত টেনে নেবারও চেষ্টা করে না।

চিৎকার করে উঠি,—চলে যাও।

তবু সে যায় না। অন্ধকারের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

—যাবে না?

—না।

—জান, আমি কার কাছে অভিসারে যাচ্ছি? ইচ্ছে করলে তোমার মত শত সহস্র আবদুল্লাকে এক হুকুমে খতম করে দিতে পারি?

—কার কাছে যাচ্ছ রাণাদিল্?

—তুমি জান না বলতে চাও? সেদিন দেখেও বোঝোনি?

—সেদিন তো দারাশুকোর আহ্বানে গিয়েছিলে। আজ?

—তুমি আমাকে এত ছোট ভাব? নিত্য নতুন পুরুষের কাছে যাব?

—আমি কিছুই ভাবি না। তবে যদি বল, আজ দারার কাছে যাচ্ছ, আমি বিশ্বাস করব না।

এতক্ষণে চৈতন্য হয় আমার। সত্যিই তো। এমন চুপিসারে কোন নর্তকী বাদশাহ্‌জাদার কাছে যায় না। আবদুল্লা মূর্খ নয়। কিন্তু আমার গন্তব্যস্থলের কথা তাকে বলা যাবে না। বলা যাবে না, আমি মরতে চলেছি। কিন্তু এখন না গেলে মনে করবে তারই ভয়ে পেছিয়ে গেলাম।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। সমস্ত ক্রোধকে বিসর্জন দিয়ে নম্র কণ্ঠে বলি,—তুমি যাবে আমার সংগে আবদুল্লা?

—কোথায়?

—আমি যেখানে যাব। তুমি সংগে থাকলে রাতের নগরীকে ভয় পাব না। যাবে?

—কতদূরে?

—বেশীদূর নয়। ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যে।

—ফিরে আসবে?

—হঁ্যা।

—তবে যে বললে—

—মিথ্যে।

—বেশ। চল।

মনে মনে বলি, হে ঈশ্বর! আবদুল্লা যেন এনায়েতের আসল পরিচয় না জানে। ওকে কিছুটা দূরে অপেক্ষা করতে বলে, এনায়েতের সংগে দেখা করে

বিষ চেয়ে নেব। আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে, এনায়েত শেষ পর্যন্ত রাজী হবে। অত পাষাণ ও নয়।

অনেকটা পথ কোন কথা বললাম না আমি। আবদুল্লাও মূক। সে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত আমাকে অনুসরণ করে চলে। নির্জন পথ। আমি নারী, সে পুরুষ। অথচ কোন চাঞ্চল্য নেই তার।

এনায়েতের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই আবদুল্লা বলে,—রাণাদিল্। তোমার প্রয়োজন কি এনায়েতের কাছে ?

বুক কেঁপে ওঠে, চেনে ? চেনে আবদুল্লা ?

ঘুরে দাঁড়াই। আবদুল্লাও থামে। ব্যবধান সামান্য দুজনার ভেতরে।

কিছুক্ষণ আগে যে-হাতে দংশন করেছিলাম ওর, সেই হাতখানা টেনে নিয়ে বলি,—একটা সত্যি কথা বল।

—কী কথা রাণীদিল্ ?

—আমায় তুমি ভালবাস ? আমি নারী বলে ?

এবারে আবদুল্লা ধীরে ধীরে তার হাত ছাড়িয়ে নেয়। তারপর আমার দুই কাঁধ আলগোছে চেপে ধরে বলে,—সত্যি কথা শুনতে চাও রাণাদিল্ ?

—হ্যাঁ। তাহলে তোমাকে কয়েকটা কথা বলে বাঁচব।

—আমার প্রথম যৌবন রাণাদিল্। এই বয়সের চাঞ্চল্য নারী হয়ে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে কিনা জানি না। তাই তোমার ওপর আকর্ষণ থাকা খুব দোষের কি ?

—না।

—কিন্তু আমি তোমাকে সেইভাবে দেখবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তোমার মুখ আমার বুকের ওপর কল্পনা করে ব্যর্থ হয়েছি। সেই দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তোমাকে আমার আলিংগনের ভেতরে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি। ঠিক ভাবে পারি নি। পরে বুঝেছি, তুমি নারী ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও বড় হল তুমি শিল্পী। তোমাকে সাদী করলে আমার জীবন ধন্য হতে পারে, কিন্তু তুমি নেমে যাবে অনেক নীচে। এই তো নির্জন রাত। তুমি রূপসী। কী অসামান্যা রূপসী নিজেও জান না। আমার ভেতরে অদম্য লোভ থাকা স্বাভাবিক। তবু তুমি নিরাপদ। তুমি যে শিল্পী। আমি সংগীত পাগল, নৃত্য পাগল। আমি তাই বোকা রাণাদিল্।

অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আমার চোখ বেয়ে। কী সুন্দর তরুণ। এমন একজন মানুষ বাদশাহ্‌জাদা হয়ে জন্মায় না ? আমার কাঁধ থেকে তার হাত দুটো টেনে নিয়ে নিজের দুই গালে রেখে বলি,—তোমাকে আমি সব বলতে পারি আবদুল্লা।

গোপন করা অন্যায় হবে। এনায়েতের কাছে এসেছি বিষ চাইতে। আত্মহত্যা করব।

—কেন রাণাদিল্‌?

—দারার উপপত্নী হতে চাই না।

—হয়ো না।

—কিন্তু আমি যে তাকে ভালবেসে ফেলেছি। কেন বাসলাম জানি না। ঐশ্বর্য্য আমার অসহ্য। হারেম কথাটা গায়ে জ্বালা ধরায়। তবু—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবদুল্লা বলে,—এতে কারও হাত নেই রাণাদিল্‌।

—তুমি আমাকে মৃত্যুতে সাহায্য কর।

—না।

—উপপত্নী হয়ে আমি কিছুতেই বাঁচব না। আমি কলুষিত।

—তবু।

—সম্ভব নয় আবদুল্লা।

—অন্তত একটি মাস অপেক্ষা কর।

—কেন?

—আর প্রশ্ন কোরো না। চল ফিরি।

একটি মাস অপেক্ষা করতে হল না। বলতে গেলে একটি দিনও নয়। কারণ ঠিক পরদিনই খোজা মতলব খাঁ হারেম থেকে এমন এক সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হল যা ছিল কল্পনার অতীত।

আবদুল্লার উপস্থিতি আর হস্তক্ষেপে বিষপানে ব্যর্থ হয়ে মন ছিল চঞ্চল। সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করে সন্ধ্যার দিকে যমুনার তীরে এক ফকির সাহেবের কাছে যাওয়ার উদ্যোগ করছিলাম। সেই সময় মতলব এলো। সে বিমর্ষ। ভাবলাম, অন্যের অধীনে থেকে বেচারার স্ফূর্তি চলে গিয়েছে।

—আজকাল তো বহিনকে ভুলে গিয়েছ মতলব।

—ভুলিনি বলেই আসি না।

—আজ এলে কেন?

—হুকুমে।

দারাশুকো আদেশ করেছে এখানে আসার জন্যে? কিন্তু কেন? আবার কি যমুনার স্রোতে রাতের অভিসার? দারা আমাকে চিনতে ভুল করেছে। সে নাকি জ্ঞানী গুণী। তার জ্ঞান তবে কিতাবেই সীমাবদ্ধ। নারীর মনের মনি-কোঠায় প্রবেশের সামর্থ রাখে না।

—দারা কি করে জানল, তুমি আমায় চেন?

—তিনি ঠিক জানেন না।

—তবে ?

—কেউ জানে না। বাদশাহ্‌জাদা বলে দিয়েছেন তোমার পাত্তা।

—সে নিজেই বলেছে ? আমাকে সে কী ভাবে ? ভেবেছে লোক পাঠালেই চলে যাব ?

—তুমি এসব বলছ কি বহিন ?

—ঠিক বলছি। তুমি চলে যাও। এখন তুমি আমার ভাই নও। এখন তুমি মতলব খাঁ। দারার দূত।

—বহিন, এত রাগছ কেন মাথায় ঢুকছে না।

—ঢুকবে না। তোমরা নোকর। মালিকের স্বার্থছাড়া মাথায় তোমাদের কিছুই ঢোকে না। বহিনের মনকেও বুঝতে চাও না।

—তোমাকে জাহানারা বেগম ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর হুকুমেই এসেছি।

—জাহানারা বেগম ? আমাকে ?

—হ্যাঁ। তুমি জান না, মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর জাহানারা বেগমের ক্ষমতা সারা হিন্দুস্থানে সবচেয়ে বেশী।

—শুনেছি। কিন্তু আমাকে তিনি চেনেন না। কেন ডেকে পাঠাবেন তবে?

—গেলেই বুঝবে। তোমার ভালই হবে বহিন।

মতলব ভাবে হারেমে গিয়ে বন্দী হলে আমার মংগল। ওর দোষ নেই। পিতাজীও যখন ভাবতে পেরেছিলেন—

—জাহানারা বেগমকে জানিয়ে দাও গে, আমি যেতে পারব না।

মতলব খাঁয়ের মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়। আমার কথা শোনা মাত্র তার পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে ওঠে। সে ধপাস্ করে মাটির ওপর বসে পড়ে।

শেষে অনেক চেষ্টার পর বারবার ঢোক গিলে সে বলে,—এর ফল কি হতে পারে অনুমান করতে পার ?

—হ্যাঁ, মৃত্যু। তার বেশী কিছু কি ?

—সেকথা বলছি না। তবে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তির অভাব নেই। সেই শাস্তির কথা চিন্তা করলেও তুমি শিহরিত হবে। কিন্তু আমি সেকথাও বলছি না।

—তবে ?

—এর ফল, দারাশুকোর মৃত্যু।

দারাশুকোর মৃত্যু ? আমি না গেলে দারাশুকোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে ? অর্থাৎ সেই এক রাতের যমুনায় জলবিহারকে শাহানশাহ্‌ বিষদৃষ্টিতে দেখেছেন ?

এত বিষদৃষ্টি যে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের জীবনও তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে ? তিনি কি তবে চান নর্তকী রাণাদিল্‌ হারেমে বসবাস করুক এবং দারার কামনাবহ্নিতে নিশ্চিন্তে ঘৃতাহুতি দিক যতদিন না তার মোহ ভংগ হয় ? এক-দিকে দারার জীবন, অন্যদিকে আমার আদর্শ আর আত্মসম্মান। কোন্‌টা বেছে নেব ?

মুহূর্তের চিন্তাতে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এনায়েত। সে সত্যিই আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। আমার মৃত্যুতে সব জটিলতার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মতলবের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলি,—শোন ভাই, তুমি কি আমাকে বহিন বলে স্বীকার কর ?

—সেকথা মুখ ফুটে বলতে হবে ? এতদিনে বুঝতে পার নি ?

—তাহলে সোজা চলে যাও। জাহানারা বেগমের কাছে গিয়ে নির্ভয়ে বলতে পার রাণাদিলের মৃত্যু হয়েছে।

—মিথ্যে কথা বলব ?

—না। এখন আমাকে যেমন জীবিত দেখছ, আজ রাতের পর আমার মৃত্যুও তেমনি সত্য। আজকের পরে কেউ আমাকে জীবিত দেখবে না।

—বহিন ? তুমি এত নির্দয় ? জেদই তোমার কাছে বড় হল ?

—বুঝবে না ভাই। আমার বেদনার কথা তুমি বুঝবে না।

—হয়ত বুঝব না। কিন্তু আমি যদি রাণাদিল্‌ হতাম, তাহলে এত নির্মম হতে পারতাম না। আমার জন্যে দিল্লীর ভাবী বাদশাহ্‌র মৃত্যু হবে, সইতে পারতাম না।

—আমি না থাকলে তাঁর জীবনের আশংকাও থাকবে না।

—বলছ কি তুমি ? একবার দেখেছ সেই চেহারা ? পালংকের সংগে তাঁর দেহ মিশে গিয়েছে। চিনতে পারবে না।

—তিনি অসুস্থ ?

—হ্যাঁ। কেন জান ? তোমার জন্যে। হারেমে ফিস্‌ফাস্‌ কথা হত, বিশ্বাস করতাম না। কত গুজব সেখানে ছড়ায় আবার মিলিয়ে যায়। শুনতাম, তোমাকে বেগম করে আনার জন্যে তিনি শাহানশাহ্‌র কাছে বারবার দরবার করে ব্যর্থ হয়েছেন। শাহানশাহ্‌ রাজী হননি। শেষে দারাশুকো মনের দুঃখে দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকলেন। এখন বলতে গেলে শেষ অবস্থা। জাহানারা বেগম তাঁকে খুব ভালবাসেন। কন্যার কথা আবার শাহানশাহ্‌ সহজে ফেলতে পারেন না। দেখতে অবিকল মমতাজ বেগমের মত কিনা। জাহানারা বেগম বলে কয়ে শাহানশাহ্‌কে রাজী করিয়েছেন প্রায়। তবে একটা সর্তে।

তোমাকে নিজের চোখে দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। দারার জন্যে বুকের ভেতরে আকুল হয়ে ওঠে। সেদিন বজরার মধ্যে দারার মন্তব্যকে গুরুত্ব দিইনি। কারণ সে অতি সহজভাবে কথাটা বলেছিল। সব বাদশাহ্‌জাদাই ওই ধরনের কথা বলতে ওস্তাদ। দারাকে চিনতে পারিনি। আমি হতভাগী। অথচ এই হতভাগীর জন্যে ওই অসাধারণ ক্ষমতাবান মানুষটি আজ মৃত্যুপথযাত্রী।

—আমায় এখুনি নিয়ে চল মতলব। এখুনি—

—পায়ে হেঁটে তো যেতে পারবে না, আমি—

—পারব। খুব পারব।

—তবু। বাদশাহ্‌জাদার সম্মানের কথা ভেবে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক, আমি আসছি।

মতলব ছুটতে ছুটতে চলে যায়।

জীবনে প্রথম হারেমের মধ্যে পদার্পণ করতে চলেছি। কত কথাই শুনেছি এই হারেম সম্বন্ধে। কত প্রবাদ—কত গল্প। শুনেছি এর মধ্যে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরে কত নারী। কত রমণী ঐশ্বর্যের লোভে এই মৃত্যু-ফাঁদে পা দেয়। কত নবাব-নন্দিনী আর রাজকুমারী পিতার স্বাধীনতা-স্পৃহা ব্যর্থ হয়েছে বলে এখানে স্থান পেয়েছে। তাদের পিতার অপরাধ মুঘলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পরাজিত কিংবা হত। এই সব নারীরা শুনেছি বড়ই অবহেলিত। বেগমের সম্মান তাদের ভাগ্যে নেই। একফোঁটা প্রেমের আস্বাদ লাভের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও তাদের জীবনে কখনো আসেনা। কালেভদ্রে আশ্রয়দাতার উন্মত্ত শোণিত-স্রোতকে শান্ত করতে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। তারপর আবার শুধু দিন যাপন। পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে শেষে পাগলও হয়ে যায় অনেকে।

এসব মতলবের মুখে শোনা। শুনেছি নগরীর পথে-ঘাটে কতজনের মুখে।

সেই হারেমে আজ প্রবেশ করতে চলেছি। সংগী মতলব খাঁ। মতলব যদি আমাকে বহিন বলে না ভাবত তাহলে এমন দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে যেতে পারতাম কিনা সন্দেহ। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করত। দুরু দুরু এখনো করছে। তবে তা হল জাহানারা বেগমের সম্মুখীন হবার কথা ভেবে। দুরু দুরু করছে দারার অবস্থার কথা চিন্তা করে। হারেমে প্রবেশের ভীতি আমার মনে স্থান পায় নি। কারণ কৌশলে আমাকে হারেমে বন্দিনী করে রাখবার জন্যে কখনই নিয়ে আসত না। মানুষ মতলব অনেক উঁচু দরের।

তবু হারেমে প্রবেশ করতে চলেছি। প্রতি পদক্ষেপে বিস্ময় উদ্রেকের নব

নব পর্যায় উন্মোচিত হয়ে চলেছে। এত ঐশ্বর্য পুঞ্জীভূত এখানে? আর এই বিপুল ঐশ্বর্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হল দারা—যে আমায় ভালবাসে। যার মাধ্যমে ভালবাসা কাকে বলে বুঝতে শিখেছি। সে আমারই অভাবে আজ শয্যাশায়ী।

—এ পথে রাণাদিল্। বাদশাহ্‌জাদার হারেম এদিকে।

মতলব খাঁ একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে ঘুরে ডান দিকে চলতে সুরু করে তাকে অনুসরণ করি।

দু'চার কদম পর পর সশস্ত্র খোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মতলবকে তারা সেলাম জানায়। যথেষ্ট প্রতিপত্তি মতলবের এখানে। নইলে এত অনায়াসে হারেমে কখনই প্রবেশ করতে পারতাম না। তবে স্ত্রীলোকদের বেলায় দ্বার অবারিত কিনা জানি না।

সুন্দর পর্দা ঝুলছে যত্রতত্র। মখ্‌মল্ আর মস্‌লিনের ছড়াছড়ি। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কোথাও বিন্দুমাত্র শব্দ নেই।

আমরা একটি প্রশস্ত স্থানে আসতেই মতলব থামে।

—থামলে কেন মতলব ভাই? এখানেই কি?

—না বহিন। আগে হলে থামতাম না। তখন আমারই ওপর ছিল হারেমের ভার। কিন্তু তুমি তো জান। আমার ওপর খবরদারী করার লোক রয়েছে। তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

মতলবের মনোবেদনার কারণ বলেই লোকটার নাম আমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। বাকী বেগ।

অল্প সময় অপেক্ষা করতে সে এসে উপস্থিত হয়। তার চেহারা এবং দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারি মতলবের মত সে সাধারণ মানুষ নয়। দারাশুকো মানুষটাকে চিনতে ভুল করেনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম কিনা জানি না, তবে তাকে দেখে ক্রোধের পরিবর্তে মতলবের জন্যে অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু অনুভব করতে পারি না। ভাবলাম, এই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে পুরুষ হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ হতে বঞ্চিত করা ঘোরতম অন্যায় হয়েছে।

বাকী বেগ আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মতলবকে বলে,—জিরাক আর দিল্-আওয়ার ওই দিকে অপেক্ষা করছে। তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে চলে এসো।

মতলব বেশ বিনীত স্বরে বলে,—আমি নিয়ে গেলে ক্ষতি আছে?

—না। তবে একটু অসুবিধা আছে। শাহ্-বুলন্দ্-ইকবালকে ক্রমাগত নিজের হাতে সেবা করে নাদিরা বেগম নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে

বিমার-খানায় নিয়ে যাওয়া-হয়েছে।

—ও। জানতাম না। তবে শরীর কালই খুব খারাপ দেখেছিলাম।

—হ্যাঁ। তাই ভাবছিলাম, তোমার যাওয়া কি উচিত হবে?

—না। ওরাই নিয়ে যাক। নাদিরা বেগমের সংগে তো ওরা দুজনই থাকে।

বাকী বেগ আর কোন বাক্যব্যয় না করে বাঁ দিকের একটা পর্দা উঠিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মতলব আমাকে নিয়ে চলে সেই জিরাক আর দিল্-আওয়ারের হস্তে সমর্পণ করতে।

—শাহ্-বুলন্দ্-ইকবাল। ইনি আবার কে মতলব?

মতলব অবাক হয়ে বলে,—জান না? বাদশাহ্জাদা দারাশুকো।

এই উপাধির কথা জানতাম না। প্রথম শুনলাম আজ। প্রতাপ আর ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের নামগুলোও গাম্ভীর্য এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয় দেখছি।

এরা কি আমাকে সোজা দারার কাছে নিয়ে যাবে? মতলব তো বলেছিল, জাহানারা বেগম আমাকে পরীক্ষা করবেন। তিনি কোথায়?

—থামলে কেন বহিন?

—আমি কোথায় চলেছি?

—শুনলেই তো।

—তবে যে জাহানারা বেগমের কথা বলেছিলে তুমি?

—তোমায় অত ভাবতে হবে না বহিন।

ওর কথায় আশ্বাস পাই না। ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ি। ওরা আমাকে বন্দী করে ফেলেছে। চারদিকের পর্দাগুলো যেন এক একটি ফাঁস হয়ে আমার কণ্ঠের সংগে জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চাইছে। আমি হাঁপাতে থাকি। মাথার ভেতরে ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে। মতলবকে প্রতারক বলে ভাবতে পারি না। কিন্তু সে অজ্ঞাতে একদল প্রতারকের হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করে ফেলেছে। এখন দারা আমাকে বেগমের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেও আজীবন হারেমে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। পলায়নের সমস্ত পথ রুদ্ধ।

—তুমি কি অসুস্থ বহিন?

—না। আমার ভীষণ ভয় করছে।

—কেন?

—তুমি হয়ত ওদের কৌশল বুঝতে পারনি।

মতলব দৃঢ়কণ্ঠে বলে,—আমি বাকী বেগের মত চতুর না হতে পারি, তবে কৌশল হলে বুঝতে পারতাম।

সরল মানুষ এই মতলব খাঁ। আমি তো বুঝেছি, জাহানারা বেগম একাধারে মুঘল বংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং ভাই-এর অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য আমাকে হারেমে নিয়ে এসেছেন। আমি কাছে থাকলে দারার মৃত্যু হবে না। তখ্‌ত্‌তাউসের মোহে আমাকে সে কখনো বেগম করতে চাইবে না। আমি পোষা হাতির মত তার দ্বারে সর্বদা মজুত থাকব।

মতলব বিদায় নেয় দুই অচেনা ব্যক্তির কাছে আমাকে সমর্পণ করে। হতাশায় আমি ভগ্ন হৃদয়। তবে জানি, আত্মহত্যার আকুলতা থাকলে কেউ বাধা দিতে পারে না। দারার সান্নিধ্যও আমাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে প্রলোভিত করতে পারবে না। আমি চাই দারার ভালবাসার স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতি মিলবে সে আমাকে বেগম করলে। নইলে শত সহস্র লক্ষ কোটি সোহাগের বাণীও মিথ্যা—ছলনা ছাড়া কিছু নয়।

হ্যাঁ, আমাকে বন্দী করে রাখার সাধ্য শাহানশাহ্‌র শত সহস্র প্রহরীরও নেই।

নিশ্চিন্তে ওদের সংগে এগিয়ে যাই। এবারে আর পা কাঁপে না একটুও। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক। আমার মাথার ভার কমে আসে। চোখের দৃষ্টিতে সহজ অনুসন্ধিৎসা ফিরে পাই।

ওরা আমাকে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পার করে নিয়ে চলে। এর কি শেষ নেই? কত বড় এই হারেম?

শেষে একটি স্থানে এসে ওরা থামে।

মনে হল, খোজার রাজত্ব বোধহয় শেষ হল। কারণ এখানে দেখি স্ত্রী লোকদের ব্যস্ততাপূর্ণ যাতায়াত। তারা সবাই আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাইলেও দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না। মনে হয়, কোন অজ্ঞাত শক্তি তাদের কর্মচঞ্চল করে রেখেছে। ইচ্ছা থাকলেও দাঁড়িয়ে পড়বার উপায় নেই। নারী সুলভ অদম্য অনুসন্ধিৎসাকে চেপে রেখে তারা এদিকে ওদিকে বড় বেশি যাতায়াত করছে—নতুন কোন নাটকের দৃশ্য অবলোকনের প্রত্যাশায়। ওদের হাবভাব দেখে মনে হয়, আমার পরিচয় ওদের কাছে আদৌ অজ্ঞাত নয়।

জিরাক আর দিল্‌-আওয়ার হারেম বাসিনীদের এই চপলতা মৃদু হাসে উপভোগ করে কিছুক্ষণ।

জিরাক শেষে বলে,—কেউ তো আসছে না। ভেতরে যাব?

দিল-আওয়ার বলে,—ক্ষেপেছিস? গর্দান যাবে।

—কে আসবে?

—নিয়াজ বিবি বানু আর ফলাকি বানু।

—সর্বনাশ।

—কেন?

—প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিতেই দম ফুরিয়ে যাবে নিয়াজ বিবি বাণুর াছে।

—মোটেই না।

—কেন?

—বাকী বেগ আসার পর খোজার ওপর অতটা খবরদারী করে কেউ? ত বছরের মধ্যে কেউ করেছে?

—তা ঠিক। তবে নিয়াজ বিবি নিজেকে একটু বেশী ভাবে।

সেই মুহূর্তে একজন রমণীর আবির্ভাবে ওদের কথা বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্য রি তারা দুজনেই রমণীটিকে সম্মান প্রদর্শন করে।

—তোমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করছ?

—বেশীক্ষণ নয়।

—যাক। আমার একটু দেরী হয়ে গেল। নিয়াজ বিবি অন্য কাজে ্যস্ত।

খোজারা দেখলাম নিশ্চিন্ত হল। তারা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। আমিও বুঝলাম এই সুন্দরী স্ত্রীলোকটির নাম ফলাকি বানু। ভাগ্যবতী মহিলা ে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামটি সার্থক।

সে খোজাদের হাতের ইসারায় চলে যেতে বলে। হারেমের কর্মচাঞ্চল্য অকস্মাৎ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ক্রীতদাসী আর পরিচারিকাদের যত কাজ সব বুঝি এদিকেই। ফলাকি বানু কঠোর দৃষ্টিতে চাইতেই যে যার মত সরে পড়ল।

আমার কাছে এসে সে প্রশ্ন করে,—তুমিই তবে রাণাদিল্?

—হ্যাঁ।

ফলাকি বানু মাধুর্যহীন হাসি হেসে বলে,—ঠিক মত সম্মান এখনো তোমাকে দেখাতে পারছি না বলে দুঃখিত।

—আমাকে কেউ সম্মান দেখায় না।

—কেন?

—নর্তকীকে বোধহয় দেখাতে নেই। তাছাড়া আমি অপছন্দ করি।

—তুমি সুন্দর কথা বল তো। আচ্ছা, চল এবারে।

—কোথায় যাব?

—এসো, দেখতে পাবে। তুমি তো নিজের পরিচয় সহজ সরল ভাবেই দিলে। কিন্তু একজন নর্তকীর জন্য যিনি এতক্ষণ বড়ো বাদশাহ্জাদার হারেমে

ধৈর্যবলে অপেক্ষা করছেন তাঁকে দেখলে বুঝতে পারবে তোমার গুরুত্ব কতখানি।

নিষ্করুণ অথচ শান্তভাবে কথা কয়টি উচ্চারণ করল ফলাকি বানু। তার কথার ধরনে আমার বুকের ভেতরে আবার কি যেন শির শির করে ওঠে। কিন্তু আমি তো মরতে চাই! ভয় কিসের?

ওকে অনুসরণ করে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে শেষে একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে হতবাক হয়ে সমুখ পানে চেয়ে থাকি।

কী দেখছি সামনে? মানবী, না পরী? নারীর এই অসামান্য রূপ কি বাস্তবে সম্ভব? বসে রয়েছেন তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। নাকের কাছে ধরে রয়েছেন একটি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত বৃহৎ আকারের গুল দাউদ।

শাহানশাহ্‌র পরিবার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। তবু নিজে রমণী হয়েও অন্যান্য সবকিছু চিন্তা ভাবনা ছাপিয়ে প্রথমেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, এই নারী রত্নটির হৃদয়ে কি প্রেম রয়েছে? যদি থেকে থাকে তবে কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ যে এই প্রেম দ্বারা অভিষিক্ত? নিশ্চয় কোন আমীর কিংবা ওয়াজির খাঁ, মীর খাঁ অথবা রুস্তম খাঁ হবেন। বয়সে তিনি তরুণ অথচ বুদ্ধিতে সাহসে পরাক্রমে যাঁর জুড়ি মেলা ভার। মনে মনে ভাবি, শাহানশাহ্‌র চেয়ে উঁচুদরের মানুষ হিন্দুস্থানে কেন নেই?

ইনিই সেই বহু-বিখ্যাত জাহানারা বেগম যাঁর মতামত স্বয়ং শাহানশাহ্‌র কাছেও অত্যন্ত মূল্যবান। মতলব খাঁয়ের কথা যদি সঠিক হয়, তবে শাহানশাহ্‌ এঁর ওপরই দারার ভবিষ্যতের সামান্য একটি অংশ নির্ধারণের ভার দিয়েছেন।

আরও অনেক রূপসী আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু চন্দ্রের পাশে কি তারার ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত হয়? তবু তাদের মধ্যে একজনের নয়নদ্বয় আমাকে আকৃষ্ট করে। বড় করুণা মাখানো। এই হারেমে অমন চোখেরও দেখা মেলে তবে।

জাহানারা বেগম সেই মেয়েটিকেই বললেন,—ওকে জিজ্ঞাসা করতো মীর নিগার বানু, অত কী দেখছে আমার দিকে চেয়ে?

মীর নিগার কাছে এসে আমার চিবুক ধরে বলে,—অবাক হয়েছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—এত রূপ কখনো দেখিনি।

মীর নিগার মিষ্টি হেসে বলে,—তুমি কি পুরুষ?

বোকার মত বলে ফেলি,—তাহলে তো পাগল হয়ে যেতাম

কথাটা একটু জোরে বলে ফেলেছিলাম। কারণ জাহানারা বেগমের মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটে ওঠে।

তিনি ইসারায় আমাকে কাছে ডাকেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াই।

তিনি শান্ত কণ্ঠে বলেন,—বাদশাহ্ বেগমকে কীভাবে সম্মান দেখাতে হয় জান না?

—না, বাদশাহ্ বেগম।

—শেখনি?

—সুযোগ পাইনি।

—পথে পথে ঘুরতে শুধু?

—হ্যাঁ, বেগম সাহেবা।

—ঠিক আছে, মার্জনা করলাম।

—আমাকে কখন যেতে দেবেন?

—পথ টানছে?

—হ্যাঁ, বেগমসাহেবা।

—ব্যস্ত হয়ো না, কাজ শেষ হলেই ছেড়ে দেব। ভয় নেই, তোমায় বন্দী করে রাখব না।

নিশ্চিন্ত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মাথা নত করলাম।

—আমি খুব সুন্দরী তাই না?

এ আবার কেমন প্রশ্ন? কী উত্তর চান তিনি?

বলি,—হ্যাঁ, আপনার হাতের গুল দাউদ আপনার আঙুলের কাছে বেমানান।

—তাই বুঝি? কিন্তু তুমি?

—আমি?

—হ্যাঁ। তুমি সুন্দরী নও?

সহজভাবে কথাটা বললেও তিনি যে উপহাস করছেন তাতে সন্দেহ নেই। লজ্জিত হই। জবাব দিতে পারি না।

—বল, তোমার জবাব শুনতে চাই।

—এ কথার জবাব দেওয়া কি উচিত হবে? আমার রোদে পোড়া শরীর, ধুলোমাখা পা, আমার পরিশ্রম আর দারিদ্র্য যেটুকু লাবণ্য নারী দেহে থাকা উচিত তাও মুছে দিয়েছে বেগমসাহেবা। পথের যে কোন স্ত্রীলোকের সংগে আমার অতি সাধারণ শ্রীর হয়ত তুলনা চলে। তাই বলে আশমানের চাঁদ আর

চিরাগের বাতির তুলনা করা ধৃষ্টতা।

জাহানারা বেগম নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি নাকি ? ভয় হয়। আমাকে মুক্তি দেবার সদিচ্ছা অন্তর্হিত হল না তো ?

চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। রুদ্ধকণ্ঠে বলি, —অপরাধ মার্জনা করুন বাদশাহ্ বেগম। কী বলতে কী বলে ফেলেছি।

এবারে তিনি এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসে আমার হাত ধরলেন। প্রফুল্ল কণ্ঠে বলেন,—অপরাধ করনি। তোমার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছি। এমন চমৎকার কথা বলা সহজ নয়।

পাষাণভার নেমে গেল বুক থেকে।

জাহানারা আমার হাত ছেড়ে দিতে একজন গোলাপজল দিয়ে সেই হাত ধুয়ে মুছে দিল।

তিনি বলেন, —তুমি সুন্দরী না হলে, দারাশুকো তোমাকে দেখে মজল কেন ?

উঃ, কী স্পষ্ট প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। চুপ করে থাকি।

মীর নিগার বলে – বাদশাহ্ বেগমের কথায় চুপ করে থাকতে নেই। এতে তাঁকে অপমান করা হয়।

—ও। আমি জানতাম না।

—এবারে জানলে। উত্তর দাও।

—বেগম সাহেবা, আমার মনে হয় বাদশাহ্‌জাদা হারেমের আড়ম্বর দেখে অভ্যস্ত বলে আমার মত পথের নর্তকীর মধ্যে নতুনত্ব দেখতে পেয়েছেন। এটা এক ধরনের মোহ। এ যে মস্ত ভুল এতদিনে নিশ্চয় জেনেছেন।

সবার চোখের দৃষ্টি কেমন হয়ে যায় আমার কথায়। এমন কি জাহানারাও কীভাবে যেন চেয়ে থাকেন আমার দিকে।

শেষে তিনি বলেন, —আমার ভাই চাইলে তুমি হারমে থাকতে রাজী আছো ?

—না বেগমসাহেবা।

বজ্রপাত হয় যেন। সবাই স্তব্ধ। যে রূপসী এতক্ষণ তার অতি মনোরম সোনার ঝালর দেওয়া পাখা একটানা চালনা করছিল তারও হাত থেমে যায়। গুল দাউদ খসে পড়ে জাহানারার হাত থেকে।

তবু তিনি সংযত কণ্ঠে বলেন, —তুমি ঠিক ধরেছ। সাময়িক মোহ

ছাড়া কিছু নয়। তবু তাতেই দারা মৃতপ্রায়। তাকে বাঁচাতে আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত। তুমি কি চাও না সে বাঁচুক!

—আমি চাই, সর্বান্তঃকরণে আমি চাই বেগমসাহেবা।

—তাকে বাঁচাতে কিছুদিন হারেমে বাস করা কি তোমার পক্ষে এতই অসম্ভব?

—না। মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে তাঁর জন্যে সবকিছুতেই আমি প্রস্তুত।

—কিন্তু সে তো বলেছে অন্য কথা। বেগম না হলে তুমি নাকি হারেমে আসবে না?

—তিনি মিথ্যা বলেন নি।

জাহানারা বেগমের মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে এবার। অসহিষ্ণুভাবে জরির পাদুকায় পদ্মের মত পা-দুখানি গলিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন করেন,—তবে এখন তুমি মিথ্যা বলছ কেন?

—মিথ্যা আমি বলি না বেগমসাহেবা। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে কিছুদিন হারেমে থাকতে প্রস্তুত আমি। কারণ তাঁর প্রাণ আমার কাছে সব চাইতে মূল্যবান। কিন্তু তিনি সুস্থ হলে আমি চলে যাব।

—আবার পথে পথে ঘুরবে?

—না। পথে পথে আব ঘোরা হবে না। পৃথিবী ছাড়ব।

—পৃথিবী ছাড়বে? তুমি বলতে চাও আত্মহত্যা করবে?

—হ্যাঁ, বাদশাহ্ বেগম। তাঁর উপপত্নী হতে চাই না। তাঁকে ভালবেসে ফেলেছি। এতে আমার হাত নেই। কিন্তু আমার ভালবাসার সুযোগে তিনি আমার নারীত্বের অবমাননা করবেন, এ সইব না। আমাকে তিনি প্রকৃত ভালবাসেন, তার একমাত্র প্রমাণ হতে পারে যদি আমাকে বেগম করে নেন। নইলে বেগম হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই।

কথা কয়টি স্পষ্টভাবে বলে উত্তেজনাবশে হাঁপাতে থাকি। যাহোক একটা কিছু হয়ে যাক। অনিশ্চয়তা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

একি! এও কি স্বপ্ন দেখছি? জাহানারা বেগম আমার মত অতি মলিন বেশধারিনী, ধূলিমলিন পথের অতি দীন নারীকে জড়িয়ে ধরলেন? ছি ছি।

—তুমি জান না রাণাদিল্, কত সুন্দরী তুমি। হারেমের একমাসের যত্নে তোমার রূপ আমার রূপের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিনী হতে পারে। কিন্তু শুধু কি বাইরের রূপ? তোমার অন্তরের রূপের তুলনা নেই। হৃদয়ের ব্যাপারে দারা কখনো ভুল করে না। তার যত ভুল বাস্তবক্ষেত্রে। সেইজন্যে আমার চিন্তা। চারদিকে কড়া নজর রাখতে রাখতে পুরুষ হয়ে উঠেছি আমি।

আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। বলতে পারি না কিছু।

—রাণাদিল্, তুমি বেগম হলে। শাহানশাহ্ তোমাকে স্বীকৃতি দেবেন। এর জন্যে অনুষ্ঠান হবে একটা।

ওঃ দারা! তুমি আমায় এত ভালবাস? আমি তোমার যোগ্য নই। তাই শুধু সন্দেহের পর সন্দেহ করে এসেছি। দ্বিধা আর সংশয়।—গুলরঙ, তুই এ সংবাদে কতই না আনন্দ পাবি। পৃথিবীতে তোর চেয়ে মংগলাকাঙ্খিনী আমার কেউ নেই।—আবতুল্লা, তুমি তরুণ হলেও সত্যদ্রষ্টা। তোমার তুলনা নেই। কখনো সুযোগ পেলে নিজেকে তোমার কাজে লাগিয়ে ধন্য হব। পিতাজী, এবারে তুমি সুখী হলে। তোমার কল্পনায় যা কখনো স্থান পায় নি তাই সাধন করেছে তোমার কন্যা। আশীর্বাদ কর।—আর বিধাতা! তোমার কী ইচ্ছা আমি জানি না। কোন মানুষ কখনও জানতে পারে না। আমি সচেতন যে সাধার পরিবারের মত মুঘল পরিবারে পুরুষের জীবন নিস্তরঙ্গ নয়। কত উত্থান পতন রয়েছে। কত রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। শুধু দয়া করে আমার নিজের আদর্শে আজীবন দৃঢ় থাকার মত মনের বল দাও। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন দারার প্রতি অনুগত থাকি। তার জীবন আমার জীবন। তার সুখদুঃখ আমার সুখদুঃখ। তার মনের প্রতিটি ঢেউ-এর সংকেত যেন আমি জানতে পারি ও বুঝতে পারি। আর কিছু নয়।

নিজেকে নর্তকী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। খোজারা ডাকে, বেগমসাহেবা। পরিচারিকারা ডাকে, বেগমসাহেবা। তাদের অত্যধিক পরিচর্যা আমার কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়। ভাবি, একজন পুরুষের ইচ্ছায় নারীর জীবনে কী অসাধারণ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

দারা সুস্থ। সে উচ্ছ্বাস-প্রবণ হয়ে উঠেছে আবার। তার কর্ম-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নাদিরা বেগমের দাবী যথাযথভাবে মিটিয়েও সে আমার কাছে আসার অবকাশ পায়। তাতেই আমি পরিতৃপ্ত। ওই অতলান্ত উচ্ছ্বাসকে ধারণ করার ক্ষমতা একা নাদিরার নেই।

দারার হারেমেও রমণীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সে-সব শুধু নিয়ম মাফিক। কারও কাছে সে যায় না। মুঘল বংশে সে এক সৃষ্টিছাড়া পুরুষ নাকি।

কিন্তু নাদিরার বড় অভিমান। সে কথায় কথায় অভিমান করতে সুরু করেছে আমি আসার পর। প্রায়ই সে নাকি বিমার-খানায় যেতে সুরু করেছে। আমার দুই পরিচারিকা ফতেমা আর গুল সুলতান বানু একথা বেশ কয়েকবার আমাকে শুনিয়েছে। তাদের হাব ভাবে বুঝতে পারি নাদিরার মানসিক ক্লেশে তারা বিচলিত এবং প্রকারান্তরে আমাকেই দায়ী করতে চায়।

কর্তব্য স্থির করে ফেলি। এক দুপুরে নর্তকীর বেশ পরিধান করে দারার উপহার দেওয়া একজোড়া নূপুর হাতির দাঁতের পোটিকা থেকে বার করে ওড়নার প্রান্তে বেঁধে ফেলি। তারপর ফতেমাকে ডেকে নাদিরা বেগমের পরিচারিকা দিল্‌জু বানুকে খবর দিতে বলি।

ফতেমা অবাক হয়ে বলে,—দিল্‌জু-বানু বেগমসাহেবা ?

—হ্যা।

ফতেমা ইতস্তত করে।

—কি হল ফতেমা ?

—কিছু না। কিন্তু সে কি আসবে ?

—কেন আসবে না ?

—আচ্ছা। বলছি গিয়ে।

দিল্‌জু-বানু আসে। তবে তার মুখের রেখায় কঠোরতার ছাপ। বুঝলাম, আমার ডাকে সে অসন্তুষ্ট। তবু সে এসেছে। কেন এল ? দারার ওপর আমার কিছুটা প্রভাব আছে বলে ? তার নিজের কোন ক্ষতি হবার আশংকায় ? জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই। এসেছে, এই যথেষ্ট।

—আমাকে তলব করছেন বেগমসাহেবা ?

—হ্যা দিল্‌জু। আমার একটা উপকার করবে ?

আচরণে বিন্দুমাত্র বিনয় প্রকাশ না করে, কথার মধ্যে যথেষ্ট ভদ্রতা মিশিয়ে সে বলে,—আপনার উপকার করা কি আমার সাধ্য ? আমি যে সামান্য বেগম-সাহেবা।

—কে সামান্য আর কে সামান্য নয়, এ-প্রশ্ন এখন মুলতবি থাক। উপকার তুমি করতে পার।

—হুকুম করুন।

—আমাকে একটি বার বিমার-খানায় নিয়ে চল।

আঁৎকে ওঠে দিল্‌জু-বানু। বলে,—সেখানে তো নাদিরা বেগম রয়েছেন। আপনি কি অসুস্থ ?

—না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। নাদিরা বেগমের কাছেই যেতে চাই আমি।

দিল্‌জু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দারাশুকোর বেগমের হুকুম কোন্ ভরসায় সে অমান্য করবে ? অথচ আমার প্রস্তাব উদ্ভট। কারণ নাদিরা বেগম কখনই সম্মত হবেন না। তাছাড়া দিল্‌জুর মত একনিষ্ঠ পরিচারিকা হয়ত ভাবছে আমি কোনরকম ক্ষতিসাধন করতে পারি নাদিরা বেগমের।

সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে,—নাদিরা বেগমের হুকুম না পেলে—

বেগমের সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে দিল্‌জুর হাত চেপে ধরি। বলি,—আমায় বেগম বলে ভেবো না তুমি। আমি পথের একজন সাধারণ নর্তকী। এটা আমার অনুরোধ দিল্‌জু। বেগমসাহেবার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি নিয়ে চল।

আমার চাহনির মধ্যে কী লক্ষ্য করল সে-ই বলতে পারে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—আসুন।

ফতেমাকে দেখলাম, আমার এই আকৃতিতে যথেষ্ট আহত। শত হলেও সে আমার পরিচারিকা। দিল্‌জুর কাছে অনেক নীচু হতে হল তাকে।

বিমার-খানায় প্রবেশের মুখে দিল্‌জু থেমে বলে,—কি বলব?

—বল, একজন নর্তকী এসেছে। নাচ দেখাতে চায়।

—যদি না দেখতে চান?

—তখন ভেবে দেখা যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। দিল্‌জু আর আসে না। একবার ভাবি নিজেই ঢুকে পড়ব। তাতে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্ট বেশী হবে ভেবে ধৈর্য ধরি।

শেষে দিল্‌জু ফিরে আসে। আস্তে আস্তে বলে,—তিনি রাজী হয়েছেন। কিন্তু অবাকও কম হন নি। বিমার-খানায় কখনো নর্তকী আসে না। আসতে দেওয়া হয় না।

—তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ দিল্‌জু।

—কিন্তু আপনাকে দেখলেই তিনি যদি ক্ষেপে ওঠেন?

—আমাকে তো তিনি চেনেন না। মুখ দেখেন নি।

—তা ঠিক। তবু আমার ভয় ভয় করছে। কিছু ঘটবে না তো?

—সে দায়িত্ব আমার।

ওড়নার প্রান্ত থেকে নূপুর জোড়া খুলে নিয়ে পায়ে পরি। তারপর নৃত্যের তালে তালে নাদিরা বেগমের কাছে গিয়ে অভিবাদন জানাই।

বুক ফেটে যায় তার অবস্থা দেখে। এ রোগ মনের। নিজের নারীত্বের গর্ব চুরমার হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। অনাস্থা এসে গিয়েছে নিজের ওপর। মনে পড়ে, সাদির সেই দিনের কথা। সেদিন এর কাছে যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না। আজ ভাল করে দেখলাম। খুবই রূপসী। কিন্তু বড় ম্লান। এই মলিনতার মূলে আমি। একজনের প্রাণ দান করতে গিয়ে আর একজনের জীবন বিনাশ করতে চলেছি। আমি হতভাগিনী। যে বাঁচল, তার প্রাণের মূল্য হিন্দুস্থানে বোধহয় সব চাইতে বেশী। তাই তার বিনিময়ে শত নাদিরা ঝরে গেলেও কিছু এসে যায় না এই প্রাসাদের মানুষদের।

—কে তুমি?

—আমি নর্তকী বেগমসাহেবা।

—এত রূপ নর্তকীর ?

—আপনার রূপের তুলনায় তুচ্ছ।

—আরশীতে মুখ দেখেছ নিজের ?

—দেখেই বলছি বেগমসাহেবা।

—কে তোমাকে খবর দিল, আমি এখানে আছি ? কেনই বা এলে ?

—আমার এক সই-এর মুখে শুনেছিলাম আপনি অসুস্থ। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই ভাবলাম যদি আনন্দ দিতে পারি আপনাকে।

—খুশী হলাম। দেখাও তোমাব নাচ।

পথের রাণাদিল্ আমি। সাধারণ মানুষের রাণাদিল্। বহুদিন পরে নৃত্য প্রদর্শনের স্যোগ পেয়ে উন্মত্ত হলাম। কল্পনা করলাম, চারপাশে শ্বেতপাথরের এই দেয়াল নেই। মাথার ওপর নেই ওই ঝাড় বাতি। এটি প্রশস্ত রাজপথ। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উৎসুক জনতার ভীড়। আর সেই ভীড়ের পশ্চাতে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রসিক আবদুল্লা।

আমার চরণদ্বয় ছন্দ সৃষ্টি করে। আমি গাইতে সুরু করি। কতক্ষণ নেচে চলি, কতক্ষণ গাই হুঁশ থাকে না। চোখের সামনে সবকিছু অস্পষ্ট। কানে ভেসে আসে জনতার মুহুর্মুহুঃ বাহবা ধ্বনি। অংগে অনুভব করি ভারী রুমালের ঘন ঘন আঘাত।

শেষে নৃত্য শেষ হয়। খেয়াল হয়, এটি রাজপথ নয়। এখানে সারা জীবনের প্রচেষ্টাতেও আবদুল্লা প্রবেশ করতে পারবে না। এটি হারেমের্ বিমার-খানা।

সর্বাংগে আমার স্বেদ। হৃদয় জুড়ে পরিতৃপ্তি।

নাদিরা বেগম বিস্মিত চোখে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সেই চোখের ভাষা ঠিক বুঝতে পারি না।

—শোনো নর্তকী। কাছে এসো।

আমি তার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

সে আমার চিবুক ধরে বলে,—তুমি এক অসাধারণ শিল্পী। আমি মুগ্ধ। কী চাও?

—যা চাই, দেবেন বেগমসাহেবা ?

—হ্যাঁ।

—এত সহজে বলে ফেললেন ? এমন কিছু যদি চাই যা দেওয়া আপনার অসাধ্য ?

—তা বটে। আমার সাধ্যের মধ্যেই চাও। আমার সব চাইতে মূল্যবান অলংকারও তোমায় দিতে পারি।

—না না। ওসবে আমার কি হবে ?

—বলছ কি তুমি। লাখ টাকার অলংকারে তোমার প্রয়োজন নেই ?

—না বেগমসাহেবা।

--অদ্ভুত নাবী তুমি। কী চাও বল।

—আপনার বিশ্বাস আর ভালবাসা।

—সে কি ? এতে তোমার লাভ ?

চোখ আমার সজল হয়। বলি,—অনেক।

—তোমায় আমি ভালবেসেছি। আর বিশ্বাস? বেশ। রাজী! তোমার মত শিল্পীকে বিশ্বাস করা যায়।

—আমি ধন্য।

—এবারে বল উপহার কী চাও ?

—কিছু না বেগমসাহেবা। আর কিছু না। আমি সব পেয়েছি।

নাদিরা বেগম বিহ্বল হয়। শেষে বলে,—কেন তুমি আমায় এত শ্রদ্ধা কর ? আমি তো তোমাব কোন উপকার করিনি। তোমার চোখ সজল। কী নাম তোমার ?

আমার সজল চোখের কূল ছাপিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। নাদিরা বেগমের পায়ের কাছে বসে, দু'হাত পায়ের ওপর রেখে বলি,—আমি রাণাদিল্।

—রা-ণা-দি-ল্ ?

—হ্যাঁ। আমায় ভালবাসুন বেগমসাহেবা। আমি শুধু নর্তকী। আর কিছু নই। বাদশাহ্জাদার প্রাণসংশয় না হলে আমাকে হারেমে দেখতে পেতেন না। যদি বলেন, আমি আত্মহত্যা করলে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না, বিষ দিন। আপনার সামনে পান করছি।

নাদিরা বেগম তাব পা থেকে আমার হাত দুটো তুলে নিয়ে বলে,—মরবে কেন ? ওকথা বলতে নেই। এমন সুন্দর একটি মন পৃথিবী থেকে চলে যাবে ? না না। তা হয় না। চল আমরা ঘরে যাই।

—কিন্তু আপনি অসুস্থ।

—না। আমি সুস্থ। কিন্তু একটা কথা রাণাদিল্।

—আদেশ করুন।

—এই বিমার-খানায় আমবা দুজনা মাঝে মাঝে চলে আসব। তোমার নাচ দেখব, গান শুনব।

—উঃ ভাবতেই পারা যায় না। কী চমৎকার হবে। আমি বেঁচে যাব। দম বন্ধ হয়ে আসে। পরিশ্রম না করলে শান্তি পাইনা বেগমসাহেবা। আমি যে নর্তকী।

দারা এক ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে আমার কক্ষে প্রবেশ করে।

আমি একটি কিতাব পড়ছিলাম। জাহানারা বেগম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। নিয়াজ বিবি বান্দু এনে দিয়েছিল।

সে কিতাবটি আমার হাতে দিয়ে বেশ ভারিক্কী চালে বলেছিল,—বাদশাহ বেগম বলেছেন, হারেমে সময় কাটাতে এটি কাজে লাগবে।

নিয়াজ বিবি খুব সম্ভবত আমাকে সহ্য করতে পারে না। তাই আমার সম্মুখে এসে তার সম্মান প্রদর্শনের ভংগী খুবই অন্যমনস্কতাপূর্ণ। যেন নেহাৎ অভ্যাসের বশে সে মাথাটা নীচু করে কপালে হাতে ঠেকায়। এটুকু না করতে পারলে বেঁচে যেত সে। তবু উপায় নেই। নোকরি যেতে পারে—এমনকি জীবনও। কারণ সে জানে হারেমের বাঁদীদের মধ্যে অনেকেই বিষ দৃষ্টিতে দেখে তাকে, শুধু স্বভাবের জন্যে। জাহানারা বেগমের প্রভাব আর প্রতিপত্তি সে বহুলাংশে তার হাবভাব, কথা আর আচরণেব মধ্যে মাখিয়ে রাখে। সবার সহ্য হয় না। তাই তার কোনরকম গাফিলাতিব কথা শাহানশাহ্‌র কানে তুলে দেবার লোকের অভাব নেই হাবেমে।

নিয়াজ বিবির হাত থেকে কিতাবটি লুফে নিয়েছিলাম। কারণ পিতাজীর আশ্রয়ে থাকার সময় তিনি আমাকে পাঠের শিক্ষা কিছু কিছু দিয়েছিলেন।

কিতাবটি হাতে নিয়ে দেখি, নাম তার "গুলিস্তান"। লিখেছেন শেখ সাদি সিরাজী। নিশ্চয়ই ভাল লেখেন। কারণ এঁর একখানা কিতাব নাদিরা বেগমের হাতে একদিন দেখেছিলাম। এঁব কিতাবে নাকি আফিমের নেশা মাখানো। প্রেমের কাহিনী রচনায় পারদর্শী।

"গুলিস্তান" পেয়ে সত্যিই দেখলাম, নেশা ধরাবার বস্তু বটে। প্রেম বিরহ আর মিলনের সব কয়টি পথের সন্ধান মেলে এই কিতাবে। কিন্তু সবই কেমন যেন অবাস্তব—স্বপ্ন-দর্শনের মত। কয়েকটি স্থান আমার কাছে বড়ই অশ্লীল বলে মনে হয়। ফতেমা একথা শুনে বলে, ওইগুলোই তো আদত জিনিস। রোশেনারা বেগম পাগল হয়ে যান। জ্ঞান থাকে না তাঁর।

আমার নির্জন কক্ষে দ্বিতীয় কোন প্রাণী না থাকা সত্ত্বেও ফতেমা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—উনি তখন কি করেন জানেন?

—না!

—বেয়াদপি মাফ্‌ করেন তো বলি।

—বল।

ফতেমা একবাব দরজার বাইরে উঁকি দিয়ে, কক্ষের সমস্ত পর্দা উঠিয়ে দেখে নিয়ে আগের মতই নিম্নস্বরে যে সব ঘটনার কথা বলে তাতে আমার সর্বাংগ ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে—গায়ের মধ্যে ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে।

শেষে চিৎকার করে উঠি,—থামো ফতেমা, যথেষ্ট হয়েছে।

ফ্যাকাশে মুখে ফতেমা স্তব্ধ হয়ে যায়।

ও সব কথা যাক্।

দারা এলো এক দ্বিপ্রহরে আমার কক্ষে, এটাই আসল ঘটনা, শেখ সাদি সিরাজীর "গুলিস্তানের" এক অধ্যায়ে যখন আমার মন অতিমাত্রায় আকৃষ্ট ঠিক তখন এলো সে।

তাড়াতাড়ি কিতাবটি তাকিয়ার ওপর ফেলে রেখে স্খলিত বসনে কোনমতে উঠে দাঁড়াতেই সে আমায় জড়িয়ে ধরে।

—হঠাৎ এই অসময়ে এত উচ্ছ্বাস দারা?

—হবে না? এবারে যে তুমি আমার সংগিনী। একা তুমি।

—তার মানে? কিসেব সংগিনী?

—যুদ্ধের।

—সর্বনাশ। কারা আক্রমণ করল এই হিন্দুস্থান?

—দুনিয়ায় কার সাধ্য? আক্রমণ আমরাই করব, কান্দাহার।

বুঝলাম। ইতিমধ্যে মুঘল রাজত্বের হাল্ফিল্ সব খবরই আমার জানা হয়ে গিয়েছে নাদিরা বেগমের সহায়তায়। সেই হাল্ফিল্ খবরের পটভূমি হিসাবে অতীতের অনেক কিছুই আমার জ্ঞাত। তাই জানি, কান্দাহার অভিযানে এর আগেও দুইবার গিয়েছে দারা। প্রথমবার আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার পর। শত চেষ্টাতেও আওরঙ্গজেবের মত কুশলী সমর নায়ক পারস্যাধিপতির কাছ থেকে কিল্লাটি ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ফলে শাহান্শাহ্র অভিলাষ অনুযায়ী দারার হাতে আক্রমণের ভার দিয়ে এবং সেই সংগে মুলতানের শাসনভার তার ওপর ন্যস্ত করে সে চলে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে।

দ্বিতীয়বারের অভিযান ছিল আরও বৃহদাকারে। সেবারে দারাশুকোকে সহায়তা করার জন্য ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ সব সেনা নায়কেরা। ছিলেন সৈয়দ খাঁ জাহান, ছিলেন রুস্তম খাঁ বাহাদুর আর ছিলেন রাজা জয় সিং ও রাজা যশোবন্ত সিং।

কিন্তু বড়ই আফশোষ হয়েছিল দারার সে যুদ্ধ সেবার আদৌ হয়নি, কারণ পারস্যের অধিপতির মৃত্যু হয়েছিল। তবু পুত্র যখন রাজধানীতে ফিরে এলো, শাহান্শাহ্ তাকে তখন বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনা জানালেন।

এইবারে সুরু হবে তৃতীয় অভিযান।

দারা এতদিন যাকে সংগিনী হিসাবে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত সেই প্রিয়তম নাদিরা বেগমকে না নিয়ে আমাকে নেবে কেন? মনে হল নাদিরা বেগমের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছি আমি। উচিত হবে না, আঘাত দিতে চাই না

আমি। দারা আমাকে বেগম করেছে এইটুকুই যথেষ্ট। আর কিছু চাই না।

তাই বলি,—আমাকে কেন দারা? নাদিরা বেগম? এতদিন তিনি একা থাকবেন? না না। তা হয় না।

দুষ্টু হাসি হেসে দারা বলে,—আর তুমি? তুমি বুঝি একা থাকবে না? কাকে নিয়ে থাকবে রাণাদিল্‌ একটু বলই না শুনি।

ছি ছি মুখে কোন আগল নেই। পুরুষদের সামনে বড় বেশী মেপে কথা বলতে হয় সময় সময়। নইলে মুখ লাল করে দেওয়া মন্তব্য করে ওরা।

—আমি তো প্রথম একা থাকছি না। অভ্যাস আছে আমার! নাদিরা বেগমের নেই। তাঁরই যাওয়া উচিত।

দারার চোখে মুগ্ধতা। সে আমাকে নিবিড় ভাবে কাছে নিয়ে বলে—একথা তোমার মুখেই শুধু সাজে। পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন নারী যদি একথা মন থেকে বলতে পারে, তবে সে নাদিরা।

—তুমি সত্যি কথা বলেছ।

—কিন্তু রাণাদিল্‌ এবারে যে নাদিরার যাবার উপায় নেই। তুমি কি জান না?

জানি বৈকি। নাদিরা বেগম আবার মা হতে চলেছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় দিন গুনছে। সন্তানের ব্যাপারে নিয়তি বড় নির্দয় তার প্রতি। যদিও ঘন ঘন পাঁচটি সন্তান তার গর্ভে এসেছিল কিন্তু বেঁচে আছে মাত্র দুইটি। সুলেমন আর পাক নেহাল-বানু বেগম প্রথম সন্তান দৌলত, তৃতীয় মেহের শুকো আর পঞ্চম মমতাজ শুকো বেশীদিন বাঁচেনি জন্মের পরে।

—আমি জানি দারা! আমি জানব না?

—শুধু তাই না। আমারই খেয়ালীপানায় কষ্টকর অভিযানে সংগ দেবার জন্যে তার কয়েকটি সন্তান বাঁচেনি। এবারে ঝুঁকি নিতে চাই না। জান তো এই বংশে একটির বেশী পুত্র থাকা অনেক নিরাপদ।

দারাশুকো মিথ্যা বলেনি। তার সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত।

তবু বলি,—নাদিরা বেগমের মত রয়েছে তো?

—হ্যাঁ। এ প্রস্তাব তারই।

কী স্বার্থপর আমি! কথাটা শুনেই লোভীর মত দুই বাহু বাড়িয়ে দারার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করে ফেলি। তাকে টানতে টানতে পালংকের ওপর নিয়ে গিয়ে ফেলি। চোখের উপর "গুলিস্তান" কিতাবের একটি দৃশ্য সজীব হয়ে ওঠে "গুলিস্তান" আমাকেও পাগল করল। কারণ আমিও মানবী, মানুষ যে সংস্কৃতির বড়াই করে সেই সংস্কৃতিই তার সরলতাকে করে বিনষ্ট। তাকে আর কদর্য আরও

বিকৃতমনা করে তোলে। বিশেষত এই হারেমের পরিবেশ বড় কদর্য।

দারার সোহাগের ভেতরে স্বপ্ন দেখে চলি, একই শিবিরে সে আর আমি। শুধু সে আর আমি। অন্য কেউ নেই। শত শত যোজনের মধ্যে নাদিরা বেগমও নেই। চারদিক পর্বত বেষ্টিত। ঝরণা নেমে আসছে তারই একটি থেকে। দূরে, পাহাড়ের চূড়ার পাশ থেকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

ভাবি, নারীরা যদি তাদের অন্তর উন্মীলিত করে দিত নরের সামনে তাহলে বোধহয় পৃথিবী থেকে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। কী হীনতাই না তাদের মধ্যে আশ্রয় করে থাকে! সামান্য উপলক্ষ্যে প্রকট হয়ে ওঠে।

—কী ভাবছ রাণাদিল্?

—কিছু না।

—এটা তুমি সত্যি কথা বলছ না।

—কি করে বুঝলে?

—আমি জানি।

—বেশ। তোমার কথাই ঠিক।

—তুমি অনেক কথা ভাবছ।

দাবার মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে বলি,—বলতো দার্শনিক, কী ভাবছি? বলতে পারলে—

—কী দেবে?

—কী দেবো? সবই তো দিয়ে বসে আছি। আর যে কিছু নেই।

—ভাবছ, কান্দাহার যাবার পথ সুখের হবে কিনা?

—তুমি দার্শনিক।

—একথা বললে কেন?

—সবাই একথা বলে। কাশীধামে উপনিষদের অনুবাদ করে যখন নাম দিলে 'শায়ার-ই-আকবরী' তখন থেকে সবাই নাকি একথা বলে?

—এত খবর রাখ?

—রাখি। রাখতে হয়।

—কিন্তু আমি যে দার্শনিক এখন তার কী প্রমাণ পেলে?

—কারণ দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছ।

—আমি মূর্খ নই রাণাদিল্। আমি ঠিক বলতে পারিনি।

—কি করে বুঝলে?

—তোমাকে নিশ্চিন্ত দেখে। তোমার দেহ আগের মতই ঢিলে ঢালা হয়ে রয়েছে।

—ঠিক বলতে পারলে, আমি কি করতাম ?

—আড়ষ্ট হয়ে যেতে। হাতের কন্ঠী এভাবে ভাঙা যেত না।

—বেশ। আমি তবে অন্যায় কিছু ভাবছিলাম।

—তা নয়। তোমাদের মনের কথা আমরা না জানতে পারলে তোমাদের সং
তে আনন্দ।

—তার মানে, তোমাদের প্রতারিত করাতেই আমাদের আনন্দ ?

—কখনই না। মনের কথা মনেই থাকবে। মংগল হবে তাতে। প্রকাশ
লে মাধুর্য থাকে না। শান্তিও থাকে না সম্ভবত।

—সব জেনে বসে আছ দেখছি।

—সব নয়। সামান্য।

দারা আমার কক্ষে। এখন কারও প্রবেশের অধিকার নেই এখানে। একমাত্র
বতের প্রয়োজন দারার। তার ওষ্ঠ শুকনো।

শয্যা ছেড়ে নেমে পড়ি।

—কোথায় চললে ?

—তোমার সরবত।

—চেয়েছিলাম ?

—মনে মনে ?

—হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। মনের কথাও বুঝতে পার তুমি ?

—আর তো কোন কাজ নেই আমার।

—সব বেগমই পারে ?

—তুমি জান না ?

—আমার বেগমের সংখ্যা নগণ্য।

—নাদিরা বেগম ?

—সে বোঝে বটে। কিন্তু তার জন্ম নবাব বংশে। আমার খুঁটিনাটি বিষয়ে
জর দেবার চেষ্টা করেও তার চোখ এড়িয়ে যায়।

—এত যে রমণী রয়েছে তোমার হারেমে, একবারও কি যাও না তাদের
ছে ?

—মনে পড়ে না। আগে গিয়েছি।

—ওরা বড় দুঃখী দারা।

—ওদের দুঃখের কথা চিন্তা করার শিক্ষা আমরা পাই না। সেই ভাবেই মন
তরী।

—ওরাও রক্ত মাংসে গড়া।

—জানি।

—ওদের হৃদয় আছে।

—অস্বীকার করি না।

—ভালবাসার ক্ষমতা বিধাতা ওদের দিয়েছেন একইরকম।

—নিশ্চয়।

—ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতাও রয়েছে।

—হ্যাঁ।

—তবে?

একমাথা এলোমেলো কেশ পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ম্লান হেসে দারা বলে,—সবাই দারা নয় রাণাদিল্। দারা মুঘলবংশে খাপছাড়া। হারেমে বহু নারী প্রয়োজন রয়েছে এ-বংশে। শুধু চাহিদার জন্যে নয় সম্মানের প্রশ্নও রয়েছে। এ প্রথা তুলে দেওয়া অসম্ভব।

তর্ক বৃথা। দারা রূঢ় সত্য বলেছে।

বাইরে অপেক্ষমাণ ফতেমাকে সরবত আনতে বলি।

কান্দাহারে যাবার দিন ঘনিয়ে আসে।

নাদিরা বেগম একদিন আমাকে ডেকে পাঠায়। এই প্রত্যাশিত আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিলাম দুটি কারণে। প্রথমত, প্রতিমাসে সে আমাকে এ-ভাবে দু-একবার ডাকে। বিমার খানায় আমাদের নৃত্যের আসর বেশীদিন চালু থাকেনি। কারণ সেটি সব সময় খালি পাওয়া যায় না তার ওপর হাকিম-ই-বুজুর্গ্ এবং হাকিম-ই-মুল্‌ক্ উভয়ে একদিন অকস্মাৎ সেটি পরিদর্শনে এসে আমাদের উভয়কে দেখে তাজ্জব বনে যায়। হাকিম-ই-মুল্‌ক্ তো সোজা নাদিরার কাছে এসে তার নাড়ী পরীক্ষার জন্য অনুমতি চেয়ে বসেন। ওড়নার আড়ালে নাদিরা বেগম হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না।

শেষে ফতেমা আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে। যদিও সে নিজেই বিপদের কারণ। তাঁদের প্রবেশের সময় সাবধান করে দিলে আমরা অন্য পথ দিয়ে পালাতে পারতাম। পরে শুনেছিলাম সে ব্যাপারটা অনুমান করার আগেই তাঁরা ঢুকে পড়েছিলেন। এটা তাঁদের ছিল সাপ্তাহান্তিক পরিদর্শন। বিমার খানা কোনরকম ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে কিনা এবং সেটি স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় রয়েছে কিনা এ দায়িত্ব তাঁদের।

যাহোক, ফতেমা শেষে ওঁদের বলে যে আমরাও পরিদর্শনে এসেছিলা তাঁরা বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না। পায়ের নূপুরের ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ বন্ধ ক

.তা কোন উপায় ছিল না। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। বেগমসাহেবদের খয়াল বলেই হয়ত ধরে নিলেন।

শুধু আমাদের উপলক্ষ্য করে কঠোর স্বরে ফতেমাকে বললেন,—এভাবে এঁদের এখানে আনার আগে আমাদের মতামত জেনে নেওয়া উচিত ছিল তামার। বিমার খানার পরিবেশ বিশুদ্ধ থাকবে এমন কোন কথা নেই।

ফতেমা সব দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে বলে,—আমার অন্যায় হয়েছে।

হাকিম-ই-বুজুর্গ্ বলেন,—খুব অন্যায় হয়েছে। তুমি জান এর আগে যিনি ছিলেন তাঁর রোগ কি ?

—না হাকিম সাহেব। এর আগে তো ছিলেন সিম্-তান্-বানু। তিনি রাজমহল ভ্রমণে গিয়েছেন।

—হ্যাঁ। তবে চিরকালের জন্যে। তিনি আর ফিরবেন না।

ফতেমার সংগে আমরাও চমকে উঠি। সিম্-তান্-বানু শুনেছি দারার প্রথম যৌবনের প্রথম নারী। সত্যি কিনা বলতে পারি না। দারার সাদির পর থেকে সে অবহেলিত জীবন কাটাত। তাই বলে পাষাণে মাথা ঠুকতো না। সে সত্যিই রূপসী। একটা কোমল লাবণ্য মাখানো ছিল তার সর্ব অবয়বে। শান্ত সেই রূপ। আপন কক্ষে নিজেকে গুটিয়ে রাখত। ক্বচিৎ কখনো আমাদের সামনে পড়ে গেলে বিনয়ে মাথা নত করত। আমাদের প্রতি তার হিংসার কোন বহিঃপ্রকাশ কখনো দেখিনি। অথচ আমি আর নাদিরা নিজেদের ভিতরে তার সম্বন্ধে বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছি। সেই আলোচনায় ঈর্ষা প্রকাশ পেয়েছে। অত্যন্ত ফিঁকে হলেও সেই ঈর্ষাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কারণ দারার নব-তারুণ্যের উদ্ভাসিত ও উদ্বেলিত ঢেউগুলো তারই দেহ-মনে প্রতিহত হত একদিন। সেদিক থেকে বিচার করলে সিম্-তান্-বানু আমাদের চেয়ে সৌভাগ্যবতী।

ফতেমা উৎকণ্ঠিত কৌতূহল নিয়ে হাকিম সাহেবকে প্রশ্ন করে,—কি হয়েছে তাঁর ?

—যক্ষ্মা।

আমরা বজ্রাহত হই।

সেদিনের পর থেকে আমাদের নৃত্যের আসর বসে নাদিরা বেগমের খাসমহলে।

নাদিরা আজ ডেকে পাঠিয়েছে শুধু নৃত্য দেখার তাগিদে নয়। ডাকার দ্বিতীয় কারণ কান্দাহার যাত্রার পূর্বে কিছু উপদেশ দিতে চায় বোধহয়। বাঞ্ছিত উপদেশ। তাই বিলম্ব করি না। দারা শিকারে গিয়েছে। কখন ফেরে ঠিক নেই।

সে এসে পড়লে মুশকিল হবে। কারণ কার কাছে যে আগে যাবে ঠিক নেই। তুজনকেই তুজনার কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে।

আমাকে দেখে নাদিরা বলে,—পায়ে শব্দ নেই কেন?

হাতের মুঠো খুলে নূপুর দেখিয়ে বলি,—প্রয়োজন হলে পরব।

—ও, তুমি বুঝতে পেরেছ তবে।

—হ্যাঁ বেগমসাহেবা, আমি জানি এ সময়ে কিছু উপদেশ দেবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

নাদিরার কথা-বার্তায় ক্লান্তির ছায়া। স্বাভাবিক। সব নারীরই এমন হয়। বিরহ দীর্ঘ হলে তো কথাই নেই।

—দারার সম্বন্ধে কিছু বলব রাণাদিল্।

—বলুন।

—আমার প্রথম সন্তান বাঁচেনি, একথা তো জানই। তারপর থেকেই দারার মধ্যে এখনকার উপসর্গগুলো দেখা দিয়েছে। আগে ছিল না কিছু।

—কোন্ উপসর্গের কথা বলছেন?

—আগে সে অনেক বাস্তবমুখী ছিল। কিন্তু ওই মৃত্যু তাকে ফকির আর জ্যোতিষীদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা এনে দিয়েছে।

—এ কি খারাপ?

—সবটুকু শোনো আগে। আমি ধর্মের কথা বলছি না রাণাদিল্। দারা অবাস্তব অসম্ভব সব জিনিসে বিশ্বাস করতে সুরু করেছে। ফকিরদের বাক্য তার কাছে ধ্রুব সত্য। তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উক্তিও সে বিশ্বাস করে। নির্বিচারে বিশ্বাস করে! এ সব কি ভাল?

—না। এর মারাত্মক ফল হতে পারে।

—আমার তোমার কাছে অনুরোধ, এ-সব দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। আমি তো যেতে পারছি না।

—আমি সাধ্যমত নজর রাখব।

—ওর সংগে একদল চাটুকার সব সময় থাকে। তারা ওকে সব সময়ে উস্কে দেয়। আমার সন্দেহ হয়, তারা আদৌ ওর দোস্ত কিনা—ওর মংগল চায় কিনা। তাতিয়ে দিয়ে মজা দেখে। কার স্বার্থের কথা ভেবে ওরা এমন করছে জানা নেই।

—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব বেগমসাহেবা।

—জানি। তবু তুমি কতটা পারবে? তোমার চোখের সামনে সব কিছু হবে না। তবে সুযোগমত নিয়মিতভাবে আভাষে-ইংগিতে ওকে এসব ব্যাপারে নিরুৎসা

করার চেষ্টা করবে।

—আপনার হুকুম আমি পালন করব বেগমসাহেবা।

—জান রাণাদিল্—আমার ভীষণ ভয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে কেঁপে উঠি। ভয় হয়, ওর এই দুর্বলতা একদিন ওকে চরম বিপদে ফেলবে।

সেদিন নাচ হয় না। গানও হয় না। নাদিরা বেগমের অশ্রুসজল মুখখানি আমার মন থেকে দারাকে একা পাওয়ার আনন্দকে বহুলাংশে হ্রাস করে দেয়। মনে হতে থাকে, কান্দাহার অভিযানের প্রকৃত নেতৃত্ব দারার ওপর নয়, আমার ওপর অর্পিত হল।

দ্বারদেশে ক্রীতদাসী গুল-ই-ফারাং এসে দাঁড়ায়। সে হারেমের সংগে বাইরের সংযোগ রক্ষা করে। খোজা বাকী বেগ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে আমাদের জানায় সে।

নাদিরা গুল-ই-ফারাংকে ইসারায় প্রবেশের অনুমতি দেয়। সে ভেতরে এসে কদমবোশী করে দাঁড়ায়।

—কি খবর গুল্-ই-ফারাং?

—বড়ে বাদশাহ্জাদা দুইজন ফকির সাহেবকে এনেছেন।

—কোথায়?

—তাঁর বিশ্রামাগারে।

—সে কি! কেন এনেছেন?

—তাঁরা দুজনেই নাকি খুব বড় এক ফকির সাহেবের মুরিদ।

—কী করছেন তাঁরা?

—আপনারা অনুমতি করলে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারি। স্বচক্ষে দেখবেন।

—কি করে যাব?

—ব্যবস্থা করেছি বেগমসাহেবা। বিশ্রামাগারে যাবার পথে পুরুষদের যাতায়াত বন্ধ করা হয়েছে। ঝরোখার আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখতে পাবেন।

আমরা তখনই উঠে পড়ি। নাদিরা এক বিশেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে চায়। সেই দৃষ্টিতে ছিল রাজ্যের হতাশা। সে বলতে চাইল, কান্দাহারে যাত্রার সূত্রপাতেই সুরু হয়ে গেল। দারাশুকো প্রস্তুতিপর্বেই বাস্তববিমুখ হল।

আমার মনেও একই প্রতিক্রিয়া। কারণ প্রথম কান্দাহার অভিযানের মত এবারেও দারা চলেছে আওরঙজেবের ব্যর্থতার পরে। আওরঙজেব সচরাচর কোন কিছুতে ব্যর্থ হয় না। সে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে শাণিত বুদ্ধির দ্বারা সব কিছু বিচার করে কাজ করে। তবু সে ব্যর্থ। এর একমাত্র কারণ কান্দাহারের ব্যাপারে পারস্যের শাহ্ দৃঢ় মনোভাব নিয়েছেন। তিনি চান না, তাঁর রাজ্যের

লাগোয়া এই পর্বতসংকুল গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি হিন্দুস্থানের দখলে থাক। কারণ এতে নিজের রাজ্যের জন্যে সব সময় তাঁকে উদ্বেগে থাকতে হবে।

আওরঙজেবের সবচেয়ে প্রিয় ভগিনী রোশেনারা রটিয়ে দিয়েছে আওরঙজেবের ব্যর্থতার মূলে রয়েছে স্বয়ং শাহানশাহ্‌র ষড়যন্ত্র। তিনি নাকি উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী ও রসদ তাঁর তৃতীয় পুত্রকে দেন নি। তিনি মনে মনে চান, আওরঙজেব পরাজিত হোক এবং দারা বিজয়ী হয়ে দেশবাসীর মনে স্থায়ী আসন লাভ করুক।

রোশেনারা পাগলের মত অমন অনেক কিছুই বলে। কিন্তু এটা ঠিক, হারেমে তাকে সমর্থন করার মত একটি ছোট্ট গোষ্ঠী রয়েছে। রোশেনারার মন্তব্যগুলো তারাই অতি কৌশলে এ-কান ও-কান করে সারা হারেমে ছড়িয়ে দেয়। যেমন দিয়েছে কয়েকদিন আগে। তারা বলতে সুরু করেছে আওরঙজেব যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, দারা হবে সেখানে হত। নতুবা তাকে পেয়ারের রাণাদিল্‌কে পারস্যের শাহ্‌র কোলের ওপর তুলে দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইতে হবে।

খবরটা ফতেমা আমাকে বলেছিল। আমি নাদিরাকেও বলিনি। বলতে ভাল লাগে না। মনের মধ্যে কোন প্রতিশোধ স্পৃহাও জাগেনি। জাগলে দারাকে অন্তত বলতাম। আমি অপেক্ষা করছি কান্দাহারের যুদ্ধের ফলাফলের ওপর। কারণ তাতেই দারার পরিচয় মিলবে।

কিন্তু দারার চরিত্র এবং নাদিরার সংগে কথোপকথন ইতিমধ্যেই আমার হৃদয়ে শংকা জাগিয়ে তুলেছে। তার ওপর এখন গুল্‌-ই-ফারাং-এর মুখে দারার বিশ্রামকক্ষে দুই ফকিরের আবির্ভাবের ঘটনা নাদিরার সংগে সংগে আমাকেও বিমর্ষ করে তোলে।

দুজনা ধীরে ধীরে গিয়ে ঝরোখার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি দুই ফকির বসে রয়েছেন পাশাপাশি গালিচার ওপর। তাঁদের গায়ে শত তালি যুক্ত মলিন আলখাল্লা। হাত দুটো তাঁদের লুকানো রয়েছে আলখাল্লার ভাঁজের ভেতরে। অপাংগে নাদিরাকে লক্ষ্য করি।

সে নাক সিঁটকে রয়েছে। ফকিরদের নোংরা পোষাক সে সহ্য করতে পারছে না। সে তো পথের নর্তকী রাণাদিল্‌ নয়। রাণাদিল্‌ এ-সবের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখে না। তবে বহুমূল্য প্রস্তর নির্মিত সুসজ্জিত কক্ষে ফকির সাহেবেরা বড়ই বেমানান। নর্তকী রাণাদিল্‌ তার আগের পোষাকে এখানে যেমন অচল।

নাদিরার বিরক্তির আরও একটি কারণ রয়েছে বটে! সেটি হল তখ্‌ত্‌-তাউসের ভাবী উত্তরাধিকারী বসে রয়েছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ফকির সাহেবদের সামনে। তিনজনারই চোখ মুদিত। গভীর ধ্যানমগ্ন তারা।

ক্রীতদাসীটি লুটিয়ে পড়েছিল রোশেনারার পায়ে। ত্রিভুবনে তার কেউ কোথাও নেই। মুলতানে যে বৃদ্ধার কাছে মানুষ, সেও চোখ বুজেছে একবছর হল।

তাকে পদাঘাত করে রোশেনারা বলেছিল,- চট্‌পট্‌ উঠে দাঁড়া।

সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। নয়নে অশ্রু।

রোশেনারা হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলেছিল,—একটি সর্তে তোকে মাফ্‌ করতে পারি। পারবি?

—পারব বেগমসাহেবা। যা বলবেন পারব। নইলে উপায় নেই।

—যদি না পারিস? চুপ করে আছিস্‌ কেন? কথা বল্‌।

—আমার—আমার গর্দান নেবেন।

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছিল রোশেনারা। খুব মজা পেয়ে যায় যেন। বলে,—বেশ। তার আগে শুনে নে, এই চারাগাছগুলোকে দারা বললাম কেন।

—আমি শুনছি বেগমসাহেবা।

—সবাইকে বলতে হবে, আমি যা বলব।

—বলব বেগমসাহেবা। সবাইকে বলব।

—শোন্‌। দারাকেও এমনি যত্নে মানুষ করেছেন শাহানশাহ্‌। বাইরের ঝড়-ঝাপটা লাগবে না। বেশী আলো লাগবে না। ঝড়ে ভেঙে যাবে, আলোয় পুড়ে যাবে। ঠিক মত জল দিয়ে যাচ্ছেন গোড়ায়, যাতে বড় হয়ে ওঠে। বুঝলি?

—হ্যাঁ, বেগমসাহেবা স্পষ্ট বুঝেছি এবারে।

—ফল কি হবে জানিস?

—খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠবেন।

আবার চপেটাঘাত,—বেয়াদপ্‌।

নেকী কথাও বলে না—কাঁদতেও সাহস পায় না।

—মরবে দারা, বুঝলি? বাইরে বার হলেই মরবে।

—হ্যাঁ বেগমসাহেবা। আর ভুল হবে না।

—হুঁ। এবারে তোকে বোঝাতে হবে সবাইকে। খবরদার আমার নাম মুখে আনবি না।

নেকী তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল।

রোশেনারা দু পা এগিয়ে একটু আস্তে বলে,—খাঁ আজম খাঁকে চিনিস্‌?

চোখ দুটো বোধহয় একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল হতভাগিনীর। সে বলে ওঠে,—চিনি বেগমসাহেবা। খুব সুন্দর দেখতে।

—সুন্দর। তাই না? খু-ব সুন্দর! তাই না? তাকে হারেমে আনতে হবে। লুকিয়ে। রাতের বেলায়।

শিউরে ওঠে মেয়েটি। এতক্ষণে সে আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। হারেমে গোপনে পুরুষকে নিয়ে আসার ঘটনা তার অজানা নয়। কিন্তু আজম খাঁ? অসম্ভব।

—পারবি?

নেকীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে কথা বলতে পারে না।

রোশেনারা উন্মাদিনীর মত তাকে পদাঘাত করতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে—পারবি না? বল্ বেতমিজ্, পারবি না?

অসহ্য যন্ত্রণায় হতভাগিনী বলে,—পারব বেগমসাহেবা। ঠিক পারব আর মারবেন না। আমি পারব। আমি নিয়ে আসব।

কোনরকমে নিস্তার পেয়ে সে ছুটে এসেছিল ফতেমার কাছে। কারণ ফতেমা তার দেশের লোক। দুজনারই বাড়ী মুলতানে। সবিস্তারে ঘটনাটির কথা বলেছিল। তারপর সেই রাতেই আকিনা বেগমের পেটিকা থেকে আহিফেম চুরি করে খেয়ে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দে সচকিত হই। চেয়ে দেখি ঝরোখের ওদিকে একজন ফকির চক্ষু উন্মীলিত করলেন।

একটু নড়ে চড়ে বসে আবার চোখ বন্ধ করে হাতদুটিকে সম্মুখে প্রসারিত করে তিনি ধীরে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন,—আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি দেখছি পারস্য দেশে এই মুহূর্তে কী ঘটে চলেছে। ওই তো প্রাসাদের মিনার। ওই তো শাহ্‌র কক্ষ। বেগমরা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। বাইরে প্রজাদের ভিড়। শাহ্ এই মাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ওই তো মাথাটা একপাশে হেলে পড়ল। হাকিমের দেওয়া দাবাই ওষ্ঠের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ফকির স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি আবার চোখ খোলেন। তারপর দুহাত দিয়ে মুখ মুছতে থাকেন।

আবার দীর্ঘশ্বাস। এবারে দ্বিতীয় ফকির। তিনি দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর রাখেন। তারপর বলেন,—হাঁ্যা হাঁ্যা, সাচ্ বাত্। তাই তো দেখছি। ওই যে শায়িত রয়েছেন শাহ্। মুখে এখনো পৃথিবীর চিন্তা ভাবনার ছাপ পরিব্যাপ্ত। একটু পরেই সব মিলিয়ে যাবে। হাঁ্যা, ওই যে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। রোগযন্ত্রণার চিহ্নও ফিকে হয়ে আসছে। কিন্তু এখন তো আমার ফিরে আসার উপায় নেই। আমি দেখব। শাহ্‌র শবাধার

যতক্ষণ না মাটির নীচে সমাধিস্থ হচ্ছে, ততক্ষণ আমায় থাকতে হবে। নিশ্চিন্ত হতে হবে।

নাদিরা আমার হাত চেপে ধরে। আমিও অবাক হয়ে থাকি। এবারে বোধহয় দারা সন্তুষ্ট। দুই ফকিরের কথা শুনেছে। নিশ্চিন্ত মনে কান্দাহার অভিযানে যাবে।

কিন্তু বসেই রইল সে। অবিচল। চোখ বন্ধ। তারপর একি! সেও যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে! হ্যাঁ, তাইতো। দারাও ফকিরদের মতো হাত দুখানা তুলে নেয় পাশ থেকে। চোখ খোলে। মুখে মৃদু হাসি।

সে বলে,—আমিও দেখছি এক মাফাসকা। স্পষ্ট দেখেছি এখুনি! সাতদিনের বেশী কান্দাহারে থাকতে হবেনা আমাকে। সেই সাতদিনে কান্দাহারের কিল্লার পতন অনিবার্য। শাহ্ আব্বাসের মৃত্যু সত্য ঘটনা। আপনাদের ভ্রম হয়নি।

নাদিরা আমার হাতধরে টানতে টানতে ঝরোখার পাশ থেকে নিয়ে চলে। তার মুখে হাসি, চোখে জল।

সে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে,—এই হল দারা। বুঝলে রাণাদিল্, এই হল দারাশুকো। লোকে বলে বিরাট পণ্ডিত। অথচ শিশুর মত স্বপ্ন দেখে। একেই সামলাতে হবে তোমায় প্রতি পদক্ষেপে—রণপ্রান্তরে। পারবে?

গুরুত্বটা আমি অনুভব করি। তাই সহজে জবাব দিতে পারি না। আমি লক্ষ্য করেছি দারা যত সরলই হোক তার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড এক আত্মাভিমান। সে নিজে যা বিশ্বাস করে তাতে অবিচল থাকে। যুক্তি মানে না—মানতে চায় না।

নাদিরার কথার জবাবে বলি,—সাধ্যমত চেষ্টা করব।

—তা তো বটেই। তোমার আর কতটুকু ক্ষমতা।

সহসা নাদিরা আমায় জড়িয়ে ধরে বলে,—আমার বড় ভয় রাণাদিল্!

—আগেও একথা বলেছেন। কী সেই ভয় বেগমসাহেবা?

—তখ্ত্ তাউসে বসে চালাতে পারবে তো?

—কেন পারবেন না?

—হয়ত পারবে। কিন্তু কারও পরামর্শ যে ও গ্রাহ্য করে না।

—তখন নিশ্চয় গ্রাহ্য করবেন। কত বড় দায়িত্ব।

—কী জানি। ভীষণ ভয় হয়। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। কী বীভৎস দুঃস্বপ্ন। মুখে বলা যায় না।

—স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় বেগমসাহেবা?

—তা বটে। কিন্তু তাকে দেওয়ান-ই-খাসের চেয়ে ইবাদতখানাতে বেশী

মানায়।

নিরুত্তর থাকি। ভাবি, আমি আর কতটুকু চিন্তা করি দারার জন্যে। নাদিরা বেগমের চিন্তা কত গভীর, কতখানি যন্ত্রণাদায়ক। একেই বলে ভালবাসা। দারা অনুগ্রহ করে আমাকে বেগম করলেও, আসলে নর্তকী ছাড়া কিছু নই আমি। চিন্তার এই গভীরতা পাব কোথায়?

যাত্রা শুরু হল এক প্রভাতে।

কিছুদূর যাত্রার পরই দারা এক সময় আমার শকটে উঠে এল। পাদুকা খুলে রেখে আমার গদিকার ওপর এসে ঘনিষ্ঠভাবে বসল। বেশ স্ফূর্তিভাব তার মুখে।

দ্বিধাজড়িত স্বরে বলি,—যুদ্ধ অভিযানের সময়ে নায়কের মুখে এমন হাসিখুশী ভাব থাকে বাদশাহজাদা?

দারা জোরে হেসে ওঠে। এত জোরে খুব কম হাসতে দেখেছি। তার হাসিই কম। সে বলে,—কেন রাণাদিল্ তোমার আনন্দ হচ্ছে না? শুধু তুমি আর আমি?

—আর যুদ্ধ? এত বড় দায়িত্ব?

—মাত্র সাতদিন। যুদ্ধে আমরা জয়ী।

—আগেই বুঝে ফেলেছ?

—হ্যাঁ।

ফকির সাহেবদের কাণ্ডকারখানা অগোচরে নেই, একথা দারা জানে না। অল্প একটু হেসে বলি,—ও।

দারা আমার একটি হাত তুলে নিয়ে বলে,—এবারে নিশ্চিন্ত তো?

—তুমি পাশে থাকলে সব কিছুর মধ্যেই আমি নিশ্চিন্ত।

—বাঃ, সুন্দর বলেছ তো? এই না হলে রাণাদিল্?

আমাদের হৃদয় জুড়িয়ে যায়। এই ধরনের পুরুষ পৃথিবীতে কয়জনই বা জন্মায়! কিন্তু এ যদি মুঘল বংশে জন্ম না নিত কত ভাল হত। দারার চুলে হাত রেখে ডাকি,—বাদশাহ্জাদা।

—বল রাণাদিল্।

—তোমার কত জ্ঞান। কত কিতাব পড়েছ। সেই সব পড়েই বুঝি বোঝা যায় যুদ্ধের ফল কি হবে?

—না রাণাদিল্, ঠিক তা নয়। এই পৃথিবীতে অলৌকিক অনেক কিছু রয়েছে জ্ঞান দিয়ে যাকে স্পর্শ করা যায় না।

—তুমি সেই অলৌকিকত্বের সন্ধান পেয়েছ?

—কিছুটা পেয়েছি বৈকি ?

—আচ্ছা, আমরা আজ সন্ধ্যার পর শিবির ফেলব, সেখানে গিয়ে কি দেখব বলতে পার ?

—চেষ্টা করলে তাও বলতে পারা যায়। কিন্তু এত সামান্য ব্যাপারে সেই চেষ্টায় লাভ কি ?

—কৌতূহল বাদশাহ্‌জাদা। একটু পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হয়।

—বেশ, আমি ব্যবস্থা করছি।

—তুমি নিজে বলতে পারবে না ?

—আমিও পারি। তবে ওসবের জন্যে আরবাল্‌-ই-তুয়াত্‌ রয়েছেন। অনেক মোল্লা সঙ্গে করে এনেছি এবার।

হায় বিধাতা ! দারা যে ফকিরদেরও সংগে করে এনেছেন একথা জানতাম না। বলি.—পৃথিবীর সব যুদ্ধ অভিযানেই কি ফকির সাহেবরা সংগে থাকেন ?

—জানি না। যারা রাখে না তারা মূর্খ। আওরঙজেব মূর্খ। তাই বারবার পরাস্ত হয়।

দারা আমাকে এতক্ষণ ধরে ছিল। সহসা ছেড়ে দেয়। তার মুখ থমথমে। বুঝতে পারি, আত্মাভিমান একটু সজাগ হয়ে উঠেছে। এসেছিল আমাকে সোহাগ করতে। এই মুহূর্তে আমাকে আর আকর্ষণীয় বলে বোধ হচ্ছে না। গুরুতর অপরাধ আমার। ওকে আমোদ দেওয়াই আমার ব্রত। আমার সার্থকতা তাতেই।

—তুমি বলছ, মাত্র সাতদিনে সব শেষ হয়ে যাবে। তার মানে, তোমাকে বেশীদিন একান্তভাবে কাছে পাবো না। ভাল লাগছে না শুনে।

কথাটা শুনে তার মুখের থমথমে ভাব একটু ফিকে হয়।

আবার বলি,—তোমার যুদ্ধ তোমার। আমি ওসবের কেউ নই। কিন্তু তুমি যে আমার—শুধু আমার দারা।

দারা এবারে আমার দিকে হেলে পড়ে বলে,—হ্যাঁ রাণাদিল্‌। আমি তোমার এখন। নাদিরা দূরে সরে যাচ্ছে।

—তাহলে, এভাবে আমাকে ছেড়ে দিলে কেন ?

দারা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,—এবারে ? হল ?

তার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজে হেসে বলি,—এইভাবে যেন মরতে পারি।

এতক্ষণে দারা যে সহজ হয়েছে, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়াতে বুঝতে

তা অসুবিধা হয় না।

বাইরে ধুলো উড়ছে। পশু আর মানুষের অগুন্‌তি পায়ের আঘাতে পৃথিবীর মাটি চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছে। সেই ধুলোর কণা এই শকটে এসে প্রবেশ করছে।

আমি বলি,—কী বিরাট আয়োজন।

—এই প্রথম দেখছ বলে, অবাক হচ্ছ রাণাদিল্‌।

—ওদিকে পারস্যের সেনাবাহিনীও প্রস্তুত হচ্ছ। তাই না?

—সম্ভবত না। কারণ শাহ্‌ আব্বাস বেঁচে নেই।

—তাই বুঝি? খবর এসে গিয়েছে?

—হুঁ, এসেছে বলতে পার একরকম।

আবার সেই অলৌকিকত্বে এসে যাচ্ছে। ধাঁটাতে ভরসা পাই না।

দারা শকটের একপাশে পর্দা উঠিয়ে দেয়। ধুলো এখন আর উড়ছে না। ভালভাবে চেয়ে দেখি আমরা একটি বিশাল তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি।

দারা আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে বলে,—ওগুলো কি বলতে পার?

আমি বুঝতে পারি। ছোট ছোট শকটে বাহকেরা কামান নিয়ে চলেছে।

—কামান?

—জানো দেখছি। কিল্লার সামনে দেখেছ। কিন্তু ওগুলো কত ভীষণ জানো?

—কামান তো ভীষণই হয়।

—সেকথা বলছি না। সেই সব কামানের কথা পারস্যবাসীরা কল্পনাও করতে পারে না। ওই যে মাঝখানে বিরাট হাতীর মত কালো যেটাকে দেখছ, ওটা সবচেয়ে বড়। ছেচল্লিশ সের ওজনের গোলা ছুঁড়তে পারে।

—সর্বনাশ।

—হ্যাঁ। ওটার নামও তেমনি। কিল্লা-খুস্‌। এ ছাড়াও রয়েছে ফত্‌-মুবারক। পঁয়তাল্লিশ সের ওজনের গোলা দাগে। আর ওই যে ঝক্‌ঝক্‌ করছে? ওটার নাম আমার নাম। তোপ্‌-ই-দারাশুকো। ওটাও কম যায় না। তার পাশেরটা গড়-ভঞ্জন। ছোটগুলোর নাম মনে নেই।

আমি এবারে সত্যিই বোবা হয়ে যাই। এত সব কামান থেকে কান্দাহারের একটি মাত্র কিল্লার ওপর গোলা দাগলে সেটি কতক্ষণই বা টিকে থাকবে? নাদিরার আশংকা তবে কি অমূলক?

দ্বিপ্রহরের পর বেলা অপরাহ্নের দিকে এগিয়ে চলে। দারা তার বিশ্রাম

সুখ উপভোগ করে শকট থেকে অবতরণের আয়োজন করে।

—মনে আছে বাদশাহ্‌জাদা?

—কি?

—সেই যে—আজ কিরকম জায়গায় আমরা শিবির ফেলব?

দারা হেসে বলে,—সেকথা আমি এখনই বলে দিতে পারি। তুমি নারী তাই এ-পথ তোমার কাছে অজানা আর রোমাঞ্চকর। আমাদের কাছে নয়। বার বার যাতায়াত করেছি কয়েক পুরুষ ধরে। সারা হিন্দুস্থানের পথ আমাদের নখদর্পণে। আগে থেকেই ঠিক করা থাকে, কোথায় রাত্রিবাসের আয়োজন করতে হবে।

হতাশ হলেও সংগে সংগে বলি,—তবে জানতে ইচ্ছে হয়, সেখানে পৌছে অস্বাভাবিক কিছু ঘটবে কিনা আজ রাতের মধ্যে।

—ঠিক আছে। তোমাকে একটু পরে জানিয়ে দেব।

দারা চলে যায়। আমি অপেক্ষা করি। সে নিশ্চয় এতক্ষণ ভবিষ্যৎ বক্তাদের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছে। তাঁরাও হয়ত আলখাল্লার ভাঁজের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে শকটের মধ্যে বসেই চোখ বুজে ফেলেছেন।

বিধাতার কাছে প্রার্থনা করতে থাকি, তাঁদের ভবিষ্যৎ দর্শন যেন অসত্য প্রমাণিত হয়। তাহলে অলৌকিকত্বের প্রতি দারার মোহ কিছুটা ভেঙে গেলেও যেতে পারে। নাদিরাকে কথা দিয়ে এসেছি। এর চেয়ে আর কী চেষ্টাই বা আমি করতে পারি।

আমাদের শকট কিছুক্ষণের জন্য একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নীচে থামে। পশুদের দানা-পানি খাইয়ে সতেজ করে নেবার ব্যবস্থা মাত্র। সেই অবসরে ফতেমা এসে উঁকি দেয় পর্দা তুলে।

—কি হল ফতেমা?

—আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে বেগমসাহেবা?

—না।

—কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে?

—না।

—ইন্দরগির এসেছেন ফকির সাহেবদের সংগে। আপনি জানেন?

—তিনি আবার কে?

—জানেন না? মস্ত তান্ত্রিক সাধু। খুব নাম-ডাক।

—তুমি জানলে কি করে?

—দেখলাম। সবাই মিলে বসে কী যেন গণনা করছেন।

আমি জানি কিসের গণনা। কিন্তু ফতেমার কাছে ভাঙলাম না। বললাম,
—একটা কাজ করতে পার ফতেমা ?

—বলুন বেগমসাহেবা।

—আমার এই শকট ওঁদের কাছাকাছি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পার ?

—দুটো ঘোড়াই তো খুলে নিয়ে গিয়েছে।

—টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না ? কে চালাচ্ছে এটা ? ডাক তাকে।

—আপনি নিজে কথা বলবেন তার সংগে ?

—দোষ কি ? পর্দা থাকছে তো মাঝখানে।

ফতেমা বিস্মিত হয়। প্রথাভংগের ভালরকম নজির হয়ে থাকবে আমার এই কাজ। বেগমসাহেবারা কখনো নগণ্য চালকদের সংগে কথা বলে না। কিন্তু আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছে। আর ফতেমার কথায় চালক কখনো দু-চারজনকে সংগ্রহ করে শকটকে ওদিকে নিয়ে যাবে না।

ফতেমা একটু পরে এসে বলে,—চালক হাজির বেগমসাহেবা।

পর্দার ভেতর দিয়ে দেখি একজন যুবক এসে দাঁড়িয়েছে সামনা-সামনি। মাথা আর মুখ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে সে। এই অদ্ভুত সাজ দেখে অবাক হলাম। ওকে আমি আগাগোড়াই দেখেছি। তবে পেছন দিক থেকে। সামনা-সামনি এই প্রথম। মনে হয়, পথের ধুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু এখানে এসে খুলে ফেলা উচিত ছিল এতক্ষণে।

—শোন। শকট টেনে নিয়ে ফকির সাহেবদের কাছে রাখার ব্যবস্থা কর।

কাপড়ের ভেতর থেকে সে অস্ফুটকণ্ঠে বলে,- বহুৎ আচ্ছা বেগমসাহেবা।

অল্পসময়ের মধ্যেই সে আমার শকট লোক দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ফকিরসাহেবদের কাছাকাছি রাখে। একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠল। কিন্তু একটু পরেই থিতিয়ে গেল। দারা সম্ভবত বুঝতে পেরেছে আমার মনোভাব। তাকে শান্ত দেখে কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেল না।

অপূর্ব দৃশ্য। টিরা গালিচার ঠিক মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে বসে রয়েছে দারা। তার চারদিক ঘিরে ফকিরসাহেবরা। ওই যে কাপালিকের মত কপালে রক্তচন্দন চর্চিত—উনি নির্ঘাত ইন্দরগির।

বাদশাহ্ আকবরের দরবারে শুনেছি গুণীজনের সমাবেশ ছিল। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেন নি যে তাঁর কোন বংশধর এভাবে অলৌকিকত্বের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে ফকিরদের সমাবেশ ঘটাবে। তাও আবার দিবালোকে মুঘল বাহিনীর সম্মুখে প্রকাশ্য স্থানে। জানি না এর প্রভাব বাহিনীর ওপর কীভাবে পড়ে।

ওদের সভা একটু পরেই ভংগ হয়। দারা এগিয়ে আসে। পর্দা তুলে বলে,—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাত রাণাদিল্। অস্বাভাবিক কিছু ঘটবে এতটুকুও সম্ভাবনা নেই। এমন কি কোন বলদ বা ঘোড়ার পা খোঁড়াও হবে না।

সন্ধ্যার পর ছোট একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আমরা থামি। বুঝতে পারি এটি রাত্রি বাসের স্থান। অদূরে ছোট্ট ঝরনার কলকল শব্দ। দারা ঠিকই বলেছে। পথ ওদের নখদর্পণে। কোথায় জল পাওয়া যাবে, কোথায় থামলে ঝড়-জলের দাপটে অস্থির হতে হবে না, এসব সাত-পাঁচ ভেবে-চিন্তে সারা হিন্দুস্থানের দিকে-দিকে যুদ্ধযাত্রার পথের মধ্যে মুঘল বাহিনীকে নিয়ে বিশ্রাম করার স্থান নির্দিষ্ট করা আছে।

আমি শকটেই বসে থাকি। কারণ সৈন্যদল শিবির স্থাপনে ব্যস্ত। সেগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হবে, যাতে বেগমসাহেবার শিবিরের আব্রু নষ্ট না হয়।

হাওয়া ছিল না একবিন্দু। আমার শকটের সম্মুখে যে বাতি জ্বলছিল সেটি হাওয়ার ছোঁয়ায় এতটুকু কম্পিত নয়। গাড়ীর চালক অল্প দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দাঁড়াবার ভংগির সংগে একজনের বড় বেশী মিল। সে আজ কোথায়?

সবাই মিলে এদিক-ওদিক জটলা করছে। কিন্তু চালকটি একা ছন্নছাড়া যেন। ওর কি কোন অসুখ রয়েছে? অসুখ থাকলে তাকে খোদ বেগমসাহেবার গাড়ীর চালক হিসাবে কখনই নিয়োগ করা হত না। তবে কি ওর ওষ্ঠদ্বয় নেই? দাঁতগুলো কংকালের মত সব সময় বার হয়ে থাকে?

এই অন্ধকারেও ওকথা ভাবতে ভয় করে না। কারণ সংগে রয়েছে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু গায়ের ভেতরে কেমন করে ওঠে। বুঝতে পারি পথের রাণাদিলের হাড়ে হারেমের হাওয়া বেশ ভালভাবেই লেগেছে। নইলে কুৎসিত মানুষ সম্বন্ধে এই শ্রেণীবিভেদ কেন? আগে তো ছিল না। সৌন্দর্য প্রীতি সম্ভবত প্রতিটি মানুষের সহজাত। কিন্তু অসুন্দর সম্বন্ধে ঘৃণা বা সেই রকমের অন্য কিছু মানুষের নিজের সৃষ্টি। একথা মনে করে সান্ত্বনা পাওয়া উচিত হবে না যে অসুন্দর সুন্দরের বিপরীত গুণ বলেই মানুষের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া।

লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। মুখে তেমনি কাপড় বাঁধা। বাতির সামনে এসে দাঁড়ায় সে। তারপর ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। আমার ভীষণ রাগ হয়। কিন্তু বলতে পারি না কিছু। কারণ নিজের কাজেই ওটি

জেলেছিল সে। ফতেমা কিংবা কেউ আমাকে বাতি এনে দেয়নি। অন্ধকারের মধ্যে চালক তার মুখের বাঁধন খুলে ফেলে। বেচারা। এতক্ষণে একটু শীতল হাওয়া প্রশ্বাসের সংগে নিতে পারবে। বীভৎস মুখ কেউ আর দেখতে পাবে না। কিন্তু এভাবে ও কতদিন থাকতে পারবে? সে কি আগে থেকে অভ্যস্ত?

চালক এবারে একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। মাঝখানে শুধু একটা পাতলা পর্দা। সে শক্ত করে বাঁধা একটি দড়ি খুলছিল।

আমি খুব সন্তর্পণে পর্দা ওঠাতে থাকি। ওর দন্তশ্রেণী দেখতে হবে। ঘিন্‌ঘিনে অন্তরকে পূর্ণ করে তুলতে চাই সমবেদনায়। হারেমে বাস করলেও নর্তকী রাণাদিল্‌ আমি। সুন্দর-অসুন্দর, ঐশ্বর্য-দারিদ্র্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে আমার মনে, এ আমি চাই না।

কে যেন একটি উজ্জ্বল বাতি নিয়ে ঠিক সেই সময়ে শকটের পাশ দিয়ে ব্যস্তভাবে চলে গেল। সেই বাতির রশ্মি এসে পড়ল চালকের মুখমণ্ডলে।

না, কুৎসিত মোটেও নয়। খুব স্বাভাবিক মুখ। শুধু স্বাভাবিক বললে কম বলা হবে। খুব সুন্দর। তারুণ্যে ভরপুর আবদুল্লার মুখ কখনো অসুন্দর হতে পারে?

—আবদুল্লা!

চমকে ওঠে চালক। তারপর মাথা নীচু করে। ধীরে ধীরে স্থানত্যাগের চেষ্টা করে।

—যেওনা আবদুল্লা! শোনো।

সে হাসে। তারপর কোন মতে দেহটাকে গাড়ীর সামনে এনে বলে,—বলুন বেগমসাহেবা।

—আমি আবার বেগমসাহেবা হলাম কবে?

—আপনি তবে কি?

—তোমার কাছে তো নই। মনে-মনে কারও কাছেই আমি বেগমসাহেবা নই। যে কেউ ইচ্ছে করলে আমাকে রাণাদিল্‌ বলে ডাকতে পারে। আমার আনন্দ হয় শুনে।

—আপনার আনন্দে অন্যের গর্দান যেতে পারে।

—মুশকিল সেইখানেই। কিন্তু আমাদের পাশে এখন তো কেউ নেই। আমাকে নাম ধরে ডাকতে বাধা কি? একবার ডাকোই না শুনি। ইচ্ছে হচ্ছে খুব।

—অভ্যাস হয়ে যাওয়া খারাপ। তার চাইতে বেগমসাহেবা ডাকটি কত নিরাপদ।

—তাহলে, তোমার সংগে কথা বলে আনন্দ পাব না।

—আমার সংগে অনর্থক কেন কথা বলবেন?

—আবদুল্লা, তুমি আমাকে খুবই ঘৃণা কর। তাই না?

—ঘৃণা করলে চালক সেজে এসে এই শকটের লাগাম ধরতাম?

—জানি আবদুল্লা। আমি জানি।

—আমি চলি বেগমসাহেবা।

—হ্যাঁ, শুধু একবার রাণাদিল্ বলে ডাকো। ভুলিয়ে দাও আমি বেগমসাহেবা।

—রাণাদিল্, তোমার মনের দ্বন্দ্ব আমি বুঝতে পারি। কষ্ট হয়, নর্তকী রাণাদিল্ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছে ভেবে। নেহাৎ নীরস না হতাম যদি, তবে এই দুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে পারত।

আবদুল্লার কথা তীব্রভাবে আমার বুকে এসে বেঁধে। আমি কেঁদে ফেলি। আমার কান্না নিঃশব্দ থাকে না।

—কেঁদে না রাণাদিল্। তুমি দোষী নও, তোমার আর আমাদের বরাত।

কিন্তু কাঁদলে চলবে না। আবদুল্লাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন। হ্যাঁ, একমাত্র সে-ই আমাকে সাহায্য করতে পারে। দেরি করলে, সুযোগ আর পাবো না।

তাড়াতাড়ি তাকে আরও কাছে ডেকে, তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে ফকিরদের আর ইন্দরগিরের কথা বুঝিয়ে বলি। দারাশুকো এদের ওপর কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, সেই সংগে অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে ফকিররা কোন্ সিদ্ধান্তে এসেছেন আজকের রাত সম্বন্ধে সেকথাও জানাই।

আবদুল্লার প্রশ্ন,—আমায় কি করতে হবে বল।

—ওঁদের এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রমাণিত কর।

—বুঝেছি। কিন্তু ওতে কি বাদশাহ্জাদার হুঁশ হবে?

—চেষ্টা করতে দোষ নেই।

আবদুল্লাকে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত থাকতে দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে সে অনেক কিছু ভেবে নেয়। সে ধীরে ধীরে বলে,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো রাণাদিল্।

—তাই বলে নিজের বিপদ ডেকে এনো না। তোমার জীবনের বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না।

আবদুল্লা হেসে ফেলে।

কে যেন বাতি নিয়ে এগিয়ে আসে। আবদুল্লা তার দড়ির গিঁট খুলতে

রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমি চাপা গলায় বলি,—কাল থেকে মুখ বেঁধে রেখে অত কষ্ট করতে হবে না।

—না।

শকটের ভেতরে শুয়ে পড়ি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করি। আমি আর অসহায় নই।

ফতেমার ডাক কানে আসে। চেয়ে দেখি বাতি হাতে পর্দা উঠিয়ে সে চেয়ে রয়েছে।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বেগমসাহেবা?

—না। বড় ক্লান্ত। এ-সবে অভ্যাস নেই।

—আপনার শিবির প্রস্তুত। নিতে এলাম। চলুন সেখানেই বিশ্রাম নেবেন।

হ্যাঁ, বিশ্রাম আমাকে রাতের প্রথম প্রহরেই নিতে হবে। বেশী রাতে সব কিছু তদারক করার পরে দারা আসবে আমার কাছে। তখন আমার নিদ্রা আর আমার বশীভূত থাকবে না।

গভীর রাত। দারা নিদ্রিত আমার পাশে। মুখে তার প্রশান্তি। অন্যান্য বাদশাহ্জাদারা যুদ্ধ-অভিযানে এসে এতটা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে কিনা জানা নেই। চিন্তার গভীরতা হয়ত নিদ্রার গভীরতাও বাড়িয়ে দেয়। পাশের এই অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষটি ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্য বিধাতা। ভাবতেও সারা শরীরে জাগে শিহরণ। অথচ এই মানুষটিকে পণ্ডিত সমাজে উপস্থিত করালে সেখানেও নেমে আসে এক শ্রদ্ধাসিক্ত স্তব্ধতা। সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে তখ্‌ত্‌তাউসের কোন সম্পর্ক নেই। সেই শ্রদ্ধা এই তাকিয়ায় ন্যস্ত মস্তকের অভ্যন্তরস্থ মস্তিষ্কের প্রতি।

অথচ কী দারুণ বৈপরীত্য। যুক্তিতর্কের সীমা পেরিয়ে এই মস্তিষ্কই আবার অলৌকিকত্বের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেন এমন হয়? জানি না। ঈশ্বরের ওপর অতি-নির্ভরতার ফলেই কি? বোধহয় না। কারণ নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি দারার এক অদ্ভুত বিশ্বাস দেখা যায়। সেই সিদ্ধান্তের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ কেউ করলে দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই ক্ষিপ্ততা বড়ই অশোভন। তার ধারণা দুনিয়ায় তার চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে কেউ আসতে পারে না। তার দৃঢ় প্রত্যয়, সে যতটা বুঝতে পারে অন্যেরা তার ধারে কাছে যেতে পারে না। এই আত্মম্ভরিতা পরমজ্ঞানী মানুষটির মধ্যে কীভাবে বাসা বাঁধল ভেবে পাইনা।

আমার আর নাদিরার মিলিত প্রচেষ্টায় সেই আত্মম্ভরিতার কাঁটা তার মন থেকে কোনদিন তুলে ফেলতে পারব কিনা, বিধাতাই বলতে পারেন।

তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আজ থেকেই সেই চেষ্টার সক্রিয় সূত্রপাত। আর শুধু সেই কারণে ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে স্বল্পালোকিত শিবিরের মধ্যে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি। চোখে ঘুম আসতে দিচ্ছি না। ফকির সাহেব আর ইন্দরগিরের গণনা কখন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে, ক্ষণ ও পল গুনে চলেছি সেই প্রতীক্ষায়।

আবদুল্লা কি পারবে? কী করবে সে একা? অসম্ভব কিছু করতে গিয়ে বিপদে পড়বে না তো? আমার জন্যেই শেষে তার বিপদ ঘনিয়ে আসবে হয়ত। আর তেমন কিছু ঘটলে, মরণ না হলে আক্ষেপ যাবে না। তবে একমাত্র ভরসা আবদুল্লা মূর্খ নয়। অসম্ভবের পেছনে সে কখনো ছুটবে না।

আচ্ছা আবদুল্লা এভাবে আমার শকটের চালক হয়ে চলে এল কেন? নর্তকী রাণাদিল্‌কে নিরাপদে রাখার জন্যে? রূপসী রাণাদিলের জন্যে তার দিল্‌-এ কোন মোহ নেই? বেশ কয়েকবার প্রমাণ পেয়েও যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে রাণাদিলের ভেতরের শিল্পীই তার একমাত্র আকর্ষণের বস্তু। পৃথিবীতে এমন বোধহয় দেখাই যায় না। সত্যি হলে, এটি একটি একক দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পৃথিবীতে যে জিনিস দুর্লভ তাই যে অসম্ভব হবে এমন কোন কথা নেই। আবদুল্লার চোখে কোনদিন পুরুষের সেই অতি পরিচিত চাহনির সামান্য স্ফুলিংগও দেখতে পাই নি। সে কি পাষাণ? আসলে নারীরাই বোধহয় কলুষিত মনের। সে যেই হোক, পুরুষের চোখে তার দেহ সম্বন্ধে কোনরকম চাঞ্চল্য না দেখলে সে তৃপ্তি পায় না। আমারও কি সেই দশা? মুখে এক, আর মনে অন্য?

বাইরে সহসা কলরব শোনা যায়। শিবিরের ভারী কাপড়ের ভেতর দিয়েও বাইরের আগুনের ঝলক দেখা যায়। হৈ চৈ সুরু হয়।

দারাশুকো চমকে জেগে ওঠে। পালংক ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের নায়ককে বোধহয় এমনি সজাগ আর তৎপর থাকতে হয়। গভীর নিদ্রার মধ্যেও তারা তাদের মস্তিষ্কের একাংশকে জাগিয়ে রাখে। এই গুণটি যাদের জন্মগত, তারা প্রকৃত যোদ্ধা। জন্মগত না হলে একে সম্ভবত গভীর অনুশীলন দ্বারা আয়ত্তে আনতে হয়।

—রাণাদিল।

ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলাম। আস্তে আস্তে বলি,—কি হয়েছে তোমার?

ঘুম ভেঙে গেল ?

—তাড়াতাড়ি উঠে পড় রাণাদিল্। বোধহয় আগুন লেগেছে।

আমি হেসে উঠি। বলি,—শুয়ে পড় দারা।

—না না—ওঠো।

—কেন ?

—আগুন লেগেছে। বুঝতে পারছ না ?

—ও সব তোমার মনের ভুল। হতেই পারে না।

বিরক্তি প্রকাশ করে দারা বলে,—ঘুমের মধ্যে কী যা তা বলছ ? নাকি পাগল হলে ?

—আমি না, তুমি পাগল হয়েছ। ফকিরসাহেবরা কি বলেছেন মনে নেই ? কিছু ঘটবে না আজ রাতে। অস্থির হয়ো না। শুয়ে পড়।

—চিৎকার শুনছ না ? তোমার এখনো ঘুম ভাঙেনি।

—চিৎকার শুনছি। ঘুমও ভেঙেছে।

—তবে ?

—আমি বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝলে আবার ?

—তুমি ফকিরসাহেবদের বিশ্বাস কর না। মজা করার জন্যে ওঁদের সঙ্গে এনেছ।

—না।

—বিশ্বাস কর ?

—হ্যাঁ।

—তবে এসে শুয়ে পড়।

দারা কিছুটা বিব্রত, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। সে এগিয়ে গিয়ে পর্দা তুলে কিছুক্ষণ বাইরে চেয়ে থাকে। ধাবমান অশ্বের পদধ্বনিও শোনা যায়।

দারা ছুটে এসে তার তলোয়ার নিয়ে বাইরে চলে যায়। আমাকে বাধাদানের সুযোগ ও দেয় না। আমি বাইরে চেয়ে দেখি দারার পেছনে-পেছনে তার সব সময়ের দুইজন দেহরক্ষীও ছুটে চলেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে পালংকের ওপর বসে পড়ি। আগুনের পরিধি দেখে মনে হয় না সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। তবে ধাবমান অশ্বের পদধ্বনিতে নিজেকে বিচলিত বোধ করি। আবদুল্লাকে কি কেউ চিনতে পেরেছে ? কিংবা ধরা পড়ে যাবার উপক্রম হতে সে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছে ? পালালেও নিষ্কৃতি পাবে না। কারণ রাত্রি অবসানে যাত্রা সুরু করতে গেলে

বেগম রাণাদিলের শকটের চালকের অনুপস্থিতি বোঝা যাবে। তখনি সব সন্দেহ তার ওপর গিয়ে পড়বে। এর পরিণাম ভয়াবহ। বুক কেঁপে ওঠে ভাবতে!

দারা প্রবেশ করে।

উৎকণ্ঠা জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করি,—কি হয়েছে বাইরে?

—বিশেষ কিছু নয়। তবে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে।

—কেন?

—ফকিরসাহেব আর ইন্দরগিরের শকটগুলোতে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আর সেই সব শকটের ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলো পালিয়েছে।

হাসি চাপতে দম বন্ধ হয়ে আসে। শয্যায় লুটিয়ে পড়ি।

দারা ব্যস্ত ভাবে বলে,—তুমি কি অসুস্থ রাণাদিল্?

অতি কষ্টে জবাব দিতে পারি,—না। শেষে ফকির সাহেবদের—

—তাই তো দেখছি।

—সাবাশ্ আবদুল্লা। এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর রসিকতার অধিকারী তুমি ছাড়া আর কে-ই বা হবে! কী দুর্দান্ত সাহস। তুমি অসাধারণ।

—ফকির সাহেবরা তবে তো যেতে পারবেন না দারা?

—আলবাৎ পারবেন। তাঁদের সংগে করে নিয়ে যেতেই হবে।

—কিন্তু ওঁদের কথা সত্যি হয় না দেখছি। কী লাভ নিয়ে গিয়ে? ওঁদের ওপর বিশ্বাস করে শেষে তোমার কোন বিপদ হবে না তো?

সেই স্বল্প আলোতে দেখতে পেলাম, আমার ওপর দারার দৃষ্টিতে বিধ্বংসী আগুন ছাড়া আর কিছু ছিল না। এত আগুন তার চোখে রয়েছে তা আগে জানতাম না। বুঝতে পারলাম, দার্শনিক হলেও দারার ধমনীতে প্রবাহিত মুঘল রক্ত। হতাশায় ভেঙে পড়লেও একটা আশার আলো কোন্ সুদূরে জলতে দেখলাম। অভিযানে তাকে ফকিরদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পারলেও, ওর চোখের আগুনের গতি একদিন ফকিরসাহেবদের দিকে পরিবর্তিত করতে পারব হয়ত। শুধু তার ভেতরের তৈমুরকে জাগ্রত করে তুলতে হবে—যে তৈমুর আওরঙজেবের মধ্যে আরও প্রকট।

—রাণাদিল্। অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠস্বর দারার।

—বাদশাহ্জাদা।

—তুমি বলেই মাফ্ করলাম।

কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে, যেন ভয় পেয়েছি এমনি ভাবে বলি,—অন্য কেউ হলে?

—মৃত্যু ঘটতে পারত। হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই।

—এতদূর? আমি জানতাম না তো?

—ওঁরা আল্লার সেবক। তাই আল্লা ওঁদের বাড়তি শক্তি দিয়েছেন। এই শক্তির বলে ওঁরা অনেক কিছু দেখতে পান।

—আমার ভুল হয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি, এই অগ্নিকাণ্ড, গভীর রাতের এই চাঞ্চল্য কোন ঘটনার মধ্যে পড়ে না। তাঁদের আমি অবিশ্বাস করিনি বাদশাহ্‌জাদা। করলে বারবার তোমাকে অমন করে শুয়ে পড়তে বলতাম না।

দারা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বুঝলাম বাকী রাতটুকু আমার ভাগ্যে আর সোহাগ জুটবে না। না জুটুক। দারার মোহ ভাঙাতে সারা জীবনের জন্যে যদি তার সোহাগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তাতেও রাজী।

কান্দাহারের এই তৃতীয় অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ আমি দেবো না তোমাদের। ইতিবৃত্ত শোনাবার উৎসাহ আমার আদৌ নেই। কিংবা সেই অভিযানে তখ্‌ততাউসের উত্তরাধিকারী দারাশুকোর একান্ত সংগ কতটা উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল সেকথাও বলব না। তোমরা অনুমান করে নাও। এই অবস্থায় শকটের মধ্যে বসে অত কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। হুমায়ুনের সমাধি আমাকে প্রবলভাবে টানছে। পৌঁছতে পারলে বাঁচি। তোমরাও হয়ত বাঁচবে। তোমাদের পথকষ্ট তো শুধু আমার জন্যে। আবদুল্লার জন্যেও বটে।

সেই অভিযান সম্বন্ধে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, যে যুদ্ধ-নায়ক যুক্তি, বাস্তব-বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা সিপাহ্‌সালার নির্বাচন ইত্যাদি সব কিছুতেই প্রায় ব্যর্থতা দেখান, তিনি ব্যক্তি হিসাবে যত মহৎ-ই হোন না কেন, তাঁর সংগে বিপদসংকুল পরিবেশে শিবিরে বাস করার মত বিড়ম্বনা আর কিছুতে নেই। আমার নিজের জীবনের জন্যে আমি ভাবি না। এ-জীবন অতি তুচ্ছ। কিন্তু দারার জীবন আমার কাছে মহামূল্যবান। সেই জীবনকে দুর্বল নারী হয়ে কী করে রক্ষা করব এই চিন্তা অবিরত আমাকে দগ্ধ করেছে। তাই দারার উষ্ণ ওষ্ঠ, তার বিশাল বক্ষের সুনিবিড় আলিংগন, তার কোন কিছুই আমি কান্দাহারে পৌঁছবার পর আর একদিনও উপভোগ করতে পারিনি।

নাদিরা পারত কিনা জানিনা। মনে হয় সে-ও পারত না। কতগুলো

সবজান্তা ফকিরসাহেব আর জ্যোতিষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে কোন নারীই ভরসা পায় না। নারীর ভরসা একমাত্র পুরুষকার। সেই পুরুষকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও নারীর পরিতৃপ্তিতে ঘাটতি দেখা যায় না।

আমি শিবিরে বসে দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি—মহব্বৎ খাঁ, কিলিক খাঁ, কায়ম খাঁ, চম্পৎ বুন্দেলা আর পাহাড় সিং বুন্দেলার মত সাহসী এবং বীর যোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও দারা কীভাবে ক্রমাগত ভুল সিদ্ধান্তের দ্বারা আর ভুল মানুষের ওপর নির্ভরতায় নিশ্চিত জয়কে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে দিল।

হ্যাঁ, নারী হয়েও আমি সব বুঝতে পেরেছি আবদুল্লার সহায়তায়। সে প্রতিদিনের যুদ্ধের পর্যালোচনা করত। সে বলে দিত, কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা অনুচিত। আবদুল্লা প্রতিভাপন্ন।

তাই হারা কিংবা জেতা আমার কাছে মুখ্য ছিল না। দারাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই ছিল আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাই এনেছিলাম। নাদিরার জিনিস নাদিরাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

তোমরা ভাবছ জিনিসটা কি একমাত্র নাদিরার? স্পষ্ট জবাব নেই এ-প্রশ্নের। তবে এটুকু জানি নাদিরার যদি তিনভাগ হয়, তো আমার সিকি ভাগ।

কেন?

এই 'কেন'র উত্তর নেই। এই 'কেন'র উত্তর পেতে হলে আমার বুকের মাঝখানে ঠিক এইখানে কান পাতো? শুনতে পাও কিছু? শূন্য কলসের মত ফাঁপা আওয়াজ? তা বটে। এর বেশী তোমরা শুনতে পাবে না। কিন্তু ফাঁপা আওয়াজেরও কারণ রয়েছে। নাদিরার বুকের ভেতরে অমন আওয়াজ পাবে না। সে যে পরিপূর্ণ। তার কোল-ভরা সন্তান। আর আমার? নেই।

কেন নেই? রাতের পর রাত প্রাকৃতিক পরিবেশে একই শিবিরে একই শয্যায় থেকেও আমার কোল কেন ভরে উঠল না? কত কল্পনা করেছিলাম, এবারে আমার নারীত্ব পূর্ণ হয়ে উঠবে। হলো না। দারা হয়ত নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে না সবটুকু। যেমন দেয় নাদিরাকে। তার মনের অজ্ঞাত কোণে তৈমুর বংশের কোন এক সুপ্ত বিবেক হয়ত অহরহ বলে চলেছে,—এ নর্তকী। এর সন্তান তখ্‌ত্‌তাউস অলংকৃত করার সুযোগ পেলে, তা হবে মুঘল বংশের মর্যাদাহানিকর: বেগম হয়েছে হোক—আর নয়। সাবধান দারা। নাদিরার সন্তানের সংগে এর সন্তানের দ্বন্দ্ব তোমার বংশের ইতিহাসে কালিমা লেপন করবে।

কিন্তু আমি চাইনা আমার সন্তান বাদশাহ হোক। কন্যা সন্তান হতে

পারত। তাও যে হয় না। একা একা এই প্রাচুর্যের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কারণ দারা এখন আমার কাছে বড় একটা আসে না। সে আসবে না জানতাম। প্রথমত, আমি একঘেয়ে হয়ে পড়েছি কিছুটা। অন্যদিকে নাদিরা বহুদিনের অদর্শনের পর নতুন রহস্য নিয়ে ঝল্‌মল্‌ করছে। সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটনে সে নতুনত্বের স্বাদ পায়। তার ওপর রয়েছে সদ্যজাত সন্তান। এই প্রবল আকর্ষণ ছেড়ে সে আমার কাছে আসবে কেন? হয়ত আমাকে দেখলেই তার কান্দাহারের কথা মনে পড়ে যায়।

কান্দাহারের ব্যর্থতার যেটুকু বাকী ছিল তা ষোলকলায় পূর্ণ হল রাজধানীতে ফিরে এসে। যে জাফরের নির্বুদ্ধিতা বা দারার ব্যর্থতার মূল কারণ, সেই জাফরই পেল "বরকন্দাজ খাঁ" খেতাব। আশ্চর্য! অমন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, ভীরু, হীনমনা ব্যক্তি আমি বড় একটা দেখিনি। অথচ কিলিক খাঁ? যিনি জাফরের ভুলগুলো বারবার দারার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি বাদশাহ্‌-জাদার অনুরাগ থেকে বঞ্চিত হলেন। আর সেই বীর সাহসী সিপাহশালার মহব্বৎ খাঁ? তিনি না থাকলে দারা হয়ত কোনোদিনই ফিরে আসতে পারত না। তাঁকে সামান্য একটা খিলাত দিয়েও সম্মানিত করা হল না। জানিনা এর মন কত সুদূরপ্রসারী হবে। কারণ আওরঙ্গজেব এখানে অনুপস্থিত থেকেও তার বিশ্বস্ত অনুচরদের চোখ দিয়ে প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চলেছে। সে সব কিছুর সুযোগ নেবে। সুজাও চুপ করে বসে নেই।

সমস্ত কিছুতেই ধস্‌ নেমেছে। ধস্‌ নেমেছে আমার মনেও। আর আমার যৌবনে? তাও বলতে পারো। ধস্‌ নেমেছে শাহানশাহ্‌ শাহ্‌জাহানের শাসনের শৃঙ্খলায়। ধস্‌ নেমেছে সিপাহী আর সেনানায়কদের বিশ্বাসের মূলে।

সব চেয়ে বেশী ধস্‌ নেমেছে আমার প্রতি দারার ভালবাসায়। এর জন্যে আমি দায়ী। এককালে যে রমণী রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াত, রূপ-যৌবন তার যত মনোমুগ্ধকর হোক না কেন দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সে বেকায়দা প্রশ্ন করবে, পরামর্শ দেবার স্পর্ধা দেখাবে—এ অসহ্য। সত্যিই একজন মুঘল বাদশাহ্‌জাদার কাছে এটা ধৃষ্টতা বলে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি নাদিরার মত চুপ করে বসে থাকতে পারি না। হারেমের নির্জন দুপুরে আমার গা ছম্‌ ছম্‌ করে। মনে হয় অসংখ্য অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রক্তের দুর্দমনীয় তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার আশেপাশে। শুনেছিলাম কোন এককালে চিতোরের ভাগ্যদেবী জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে বলে উঠেছিলেন—ম্যায় ভুখা হুঁ। হ্যাঁ, শুনেছি একথা। আরও শুনেছি এর পরই সেখানে সুরু হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, যার ফলে অসংখ্য বীরের রক্তে স্নাত

হয়েছিল রাজপুতভূমি। চিতোরের ভাগ্যদেবীর ক্ষুধা মিটেছিল।

কিন্তু এ-ক্ষুধা সেই ক্ষুধা নয়। এর মধ্যে রয়েছে নীচতা, হীনতা ও গোপনীয়তা। চারিদিকে ষড়যন্ত্র—শুধু ষড়যন্ত্র। দারা কেন বুঝতে পারে না? কেন আমি তার কাছে অনভিপ্রেত?

তবু আমাকে চেষ্টা করতে হবে। নবাব নন্দিনী নাদিরার মত নারীত্বের অক্ষমতা নিয়ে বসে থাকব না। চাইনা আমি দারার প্রেমের ডোরে বন্দী হয়ে থাকতে। আগে তার প্রাণ বাঁচুক। নিষ্কণ্টক হয়ে সে যদি আমাকে পদাঘাতে বিতাড়িত করে, আমি এক বিন্দুও চোখের জল ফেলব না। চলে যাব হারেম ছেড়ে আবার পথে। সেখানে দোস্ত্ আবদুল্লা আমাকে নিশ্চয় সহায়তা করবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদ সংগ্রহে। হয়ত আগের মত আমার চরণ-যুগলের চকিত চমকে স্ফুলিংগ বার হবে না। কিন্তু গাইতে পারব। নওজোয়ানেরা বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে আমাকে ঘিরে না দাঁড়ালেও অনেকে দাঁড়াবে যারা প্রকৃত সমজদার। কারণ হারেমে এসে নাদিরার পৃষ্ঠপোষকতায় আমার সংগীত আর নৃত্যের মৃত্যু হতে পারেনি।

আমি শুধু চাই দারা বেঁচে থাকুক। মুঘল-সুলভ দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে তখ্ত্ তাউসে আসীন হোক। আর কিছু নয়।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে কে যেন আমার টুঁটি চেপে ধরতে চায়। ছিটকে ঘর থেকে বার হই। কেউ নেই। চারদিক খাঁ খাঁ। অথচ স্পষ্ট অনুভব করলাম কাউকে। সেই অশরীরী আত্মার? বড় নিঃসংগ বোধ হয়। কোথায় যাই? নাদিরার কক্ষে? সেখানে যদি দারা থাকে? ফতেমা এখন উপস্থিত নেই। তাকে বাইরে পাঠিয়েছি। সে থাকলে নাদিরার কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখে আসতে পারত।

ভারী পর্দাগুলো দুলছে চারদিকে। খুব জোরেই দুলছে। বাইরে কি ঝড় উঠেছে? জানবার উপায় নেই। হারেমের প্রান্তসীমায় গেলে জানা যেতে পারে।

এগিয়ে যাই। ফতেমা ফিরে না এলে নিজের কক্ষে ঢুকতে পারব না। সেই সাহস নেই। হারেমে বাস করে আমার ভেতরের নির্ভীক রাণাদিলের মৃত্যু ঘটেছে। এখন আমি ভয় পাই। সেই ভয় নিজের জন্যে নয়। সেই ভয় যাঁর জন্যে সে আমায় অবহেলা করে। অথচ স্পষ্ট অনুভব করি, তাকে ঘিরে একটি মজবুত জাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে। এই জাল ইতিমধ্যে আমি দু-একবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।

কে কথা বলল? থমকে দাঁড়াই। কণ্ঠস্বর থেমে যায়। কান পেতে দাঁড়িয়ে

থাকি। স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। কোন ভুল নেই। নারীর কণ্ঠস্বর হারেমের এই প্রান্তসীমায়। কিছুটা দূরে দ্বারদেশে খোজা প্রহরী মোতায়েন। প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সে। আমাকে দেখতে পেয়েছে।

পায়ের সামান্য খস্‌খস্‌ আওয়াজ হয়। এবারে বুঝতে পারি। ওই ঝাড়-বাতির নীচে। সোজা সেদিকে এগিয়ে যাই। পর্দা দুলছে। হাত দিয়ে তুলে ধরি।

রোশেনারা।

শুধু সে নয়। সংগে একজন অপরিচিত পুরুষ। পুরুষটি কাঁপছে। তার মস্তক অবনত।

রোশেনারার চোখ ধক্‌ ধক্‌ করে জ্বলতে থাকে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে টকটকে মুখে বলে,—বেগমসাহেবার ঘরে দারাশুকো বুঝি অনেকদিন যায়নি? রক্ত গরম হয়ে উঠেছে বলে দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটছে?

আমি সোজা প্রশ্ন করি,—কে এ?

—তোমার প্রয়োজন নেই জানার।

—আলবৎ আছে। হারেমে পুরুষকে কেন ঢুকিয়েছেন তস্করের মত? আপনার মাতাল রক্তকে শান্ত করার জন্যে হারেমে বিপদ সৃষ্টির কোন অধিকার নেই।

—কী? নর্তকীর এত বড় স্পর্ধা?

রোশেনারা আমার দিকে ধাবিত হয়।

পুরুষটি তার হাত ধরে ফেলে বলে,—কী করছেন বেগমসাহেবা? পাগল হলেন?

ঘুরে দাঁড়িয়ে রোশেনারা খোলা হাতে পুরুষটির বুকে আঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে,—ছাড়ো।

প্রহরী খোজা নীরব দর্শকের মত দেখতে থাকে। শুধু তার হাতের অস্ত্র একটু নড়ে ওঠে।

পুরুষটি ছেড়ে দিতে ভরসা পায় না। তাকে সুপুরুষ বলা যায় না। তবে যথেষ্ট বলিষ্ঠ। তার মুখ ছাই-এর মত সাদা। ভয় পেয়েছে সে—প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। হারেমের ভেতরে ধরা পড়ে যাবার শাস্তি হিন্দুস্থানে কারও অজানা নয়।

রোশেনারা আমার কথা ভুলে গিয়ে পুরুষটিকে আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। সে ক্রোধে উন্মাদিনী। তার প্রণয়ী বাহ্য জ্ঞান শূন্য। তার খেয়াল নেই, রোশেনারার একটি হাত তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা।

অথচ পা দুটো তার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—ছাড়্ কুত্তা।

রোশেনারা তাকে পদাঘাত করে।

প্রহরী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। চোখ দুটো তার ভাবলেশহীন। হারেমের ভেতরে এতটা এগিয়ে আসা তার উচিত হবে কিনা সেই দ্বিধায় তার গতি মন্থর। জায়গাটি হল সব হারেমে প্রবেশের প্রধান দ্বারের কাছাকাছি।

যেই মুহূর্তে প্রহরী পুরুষটির মুখ ভালভাবে দেখতে পায় তখনি সে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে এসে পুরুষটির হাত চেপে ধরে।

রোশেনারা মুক্তি পেয়ে হাঁপাতে থাকে। আমার প্রতি তার ক্রোধের কথা সে সত্যিই বিস্মৃত হয়। খোজার দিকে চেয়ে তীব্র কণ্ঠে সে বলে ওঠে,—কে ঢুকতে দিয়েছে একে?

—কেউ নয় বেগমসাহেবা।

—কি বললে? কেউ ঢুকতে দেয়নি?

—না, বেগমসাহেবা।

—হারেমে তবে কি করে এলো?

—সামনের দরওয়াজা দিয়ে কখনো আসেনি।

—তবে?

—জানি না।

—তোমাদের গর্দান যাবে।

খোজার মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়।

রোশেনারা বিকৃত কণ্ঠে আবার ধমকায়,—গর্দানের মায়া নেই তোমার?

খোজা নিরুত্তর।

—জবাব দে বেয়াদপ।

—গর্দানের মায়া কার নেই বেগমসাহেবা?

—তাহলে এই মুহূর্তে একে খুন কর্।

আমি আতংকিত হয়ে উঠি রোশেনারার নৃশংসতায়। প্রণয় করতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রণয়ীকে অনায়াসে হত্যা করতে চাইছে পিশাচী নিজের সম্মান রাখতে।

- চুপ করে আছিস কেন?

পুরুষটি অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে রোশেনারার দিকে চায়। মৃত্যু ভয়ও তার বিলুপ্ত হয়েছে বিস্ময়ের আতিশয্যে! ভাবছে হয়ত, এই সুন্দরী রমণী একটু আগেও তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কত মধুর কথাই না বলছিল।

খোজা এবারে আমার দিকে চায়। আমি তাকে নিবৃত্ত থাকতে বলি।

—খুন কর্।

খোজা উপযুক্ত মর্যাদার সংগে সংযত ভাবে বলে,—একে নিয়ে যেতে হবে বেগমসাহেবা। জানতে হবে, কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে সে হারেমে এসেছে। আমার দিক দিয়ে ঢুকলে আমার গর্দান যাক্ ক্ষতি নেই।

রোশেনারা হাত-পা ছুঁড়ে অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে। শেষে খোজার দিকে ছুটে যায়। খোজা হেঁচকা টানে পুরুষটিকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে রোশেনারা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

খোজা পুরুষটিকে নিয়ে বাইরের দিকে চলতে থাকে। রোশেনারার ক্রোধে সে ভীত হলেও, আমার কাছ থেকে ভরসা পেয়েছে সে।

জানি, বিচারে হতভাগ্য পুরুষটির মৃত্যুদণ্ড হবে। সে সব কিছুই স্বীকার করবে! কীভাবে রোশেনারা তাকে হারেমে নিয়ে এসেছে সব বলবে সে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী হারেমের প্রহরা আরও কড়া হবে। আরও দু একজনের মৃত্যুদণ্ড হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কারণ সত্যি বলে ধরে নিলে বাদশাহ নন্দিনীর সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে।

রোশেনারা স্থানত্যাগ করে। অনেক মেহনতের ফল ওই পুরুষটি তার হাতছাড়া হয়ে গেল। আবার নতুন উদ্যম নিয়ে স্বরু করতে হবে তাকে। মুশকিল হয়েছে, তার কক্ষে মাঝে মাঝে পুরুষের অনুসন্ধান করা হয়। শাহান-শাহ্‌র হুকুম। তিনি নিজেও এসেছেন একবার। তাই প্রণয় লীলা আপন কক্ষে জমে না।

মতলব খাঁ আমার দর্শনপ্রার্থী হল একদিন। হারেমের রক্ষীদলের নেতা হিসাবে আমার দর্শনপ্রার্থী হবার অধিকার রয়েছে তার। বহুদিন ধরে বাকী বেগের অধীনে থাকায় আমার সংগে দেখা করার সুযোগ পায়নি সে। এখন বাকী বেগ এখানে নেই। সামান্য হারেমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তার মত এক উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের ব্যক্তিকে আটকে রাখা অপব্যয় বলে গণ্য হত। সে অনেক উঁচু দরের মানুষ। যোগ্যতার পুরস্কার সে পেয়েছে। বাকী বেগ নামে এক খোজার অস্তিত্বের কথা সবাই বিস্মৃত হতে বসেছে। নাম তার এখন বাহাদুর খাঁ। এলাহাবাদ আর চুনারের শাসনভার তার ওপর। বাদশাহজাদা দারাশুকোর নামে সে শাসনকার্য চালাচ্ছে।

মতলব খাঁ এখানেই পড়ে রয়েছে। সে তার আগের পদমর্যাদা ফিরে

পেয়ে সন্তুষ্ট।

আমার সংগে তার সাক্ষাতের কী কারণ ঘটল বুঝলাম না। রোশেনারা প্রায়ই একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে হারেমে। তবে দারাশুকোর হারেমের আওতায় তা পড়ে না। তবু সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে মতলব।

মতলব খাঁ ফতেমার নির্দেশে আমার সামনে এসে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়।

আমি ফতেমাকে চলে যেতে ইংগিত করি।

মতলব অত্যন্ত মর্যাদার সংগে বলে,—বেগমসাহেবার অসুবিধা সৃষ্টি করলাম বলে মাফ চাইছি।

হেসে বলি,—বহিনের সংগে চমৎকার কথা বলা শিখেছ তো মতলব খাঁ।

সে চমকে উঠে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

—কী দেখছ মতলব?

—আমি—আপনি কি—

—ঢের হয়েছে। এবারে সোজাসুজি কথা বলতো? তোমাদের এই সব আদব কায়দা আমার ভাল লাগে না। বাকী বেগ বিদায় নেবারপর থেকে দেখছি মাটিতে পা পড়ে না।

—আপনি—

—আঃ, মতলব। বহিন বলে আমাকে যদি ভাবতে তাহলে এমন ব্যবহার করতে না।

—বহিন—

আবেগে মতলব থরথর করে কেঁপে ওঠে। চোখ তার বাষ্পাকুল হয়।

ওর হাত ধরে বলি,—বেগমসাহেবা হলেও বহিন বহিনই থাকে।

স্বাভাবিক হতে বেশ সময় যায় ওর। অবশেষে আগেকার সেই হাসিখুশী মানুষটি আত্মপ্রকাশ করে।

অনেক সুখদুঃখের কথার পর বলি,—এবারে তোমার কাজের কথা হোক।

একটু চুপ করে থেকে মতলব গলার স্বর নামিয়ে বলে,—আবদুল্লা বলে কাউকে চেন বহিন?

ভীত হই। ধরা পড়ল নাকি আবদুল্লা কিছু করতে গিয়ে? বলি,—কেন বলতো?

হেসে সে বলে,—ভয় পাচ্ছ কেন? ভাইকে ভয়?

—তোমাকে নয়। আবদুল্লার বিপদের কথা ভেবে।

—না। সে নিরাপদ। দেখা করতে চায় তোমার সংগে

—জরুরী ?

—হ্যাঁ।

—কীভাবে দেখা করব ?

—সে ভার আমার। কিন্তু কবে পারব বলতে পারি না।

—হারেমে ?

—না। বাইরে। যমুনার তীরে মসজিদের পাশে।

—কবে ?

—পরে জানাবো।

মতলব খাঁ বিদায় নেবার পর থেকে মন অস্থির হয়ে ওঠে। আবদুল্লা বিনা কারণে কিংবা সামান্য কারণে আমার দর্শনাকাঙ্খী হয়নি। কিন্তু কী সেই কারণ ? ভেবে কিছু ঠাহর করতে পারি না। মতলবের সংগে সে কি করেই বা যোগাযোগ করল ?

তার অসাধ্য কিছু নেই। বুদ্ধি-বলে সে বেগমসাহেবার শকটের চালক হতে পারে। অসাধারণ তৎপরতায় সে শত প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে ফকিরসাহেবদের গাড়ীতে অগ্নি-সংযোগ করতে পারে। মতলবের সংগে যোগাযোগ দুঃসাধ্য কিছু নয় তার পক্ষে।

আবদুল্লার সংগে সাক্ষাৎ হল ঠিক চারদিন বাদে। মতলব খাঁ অত্যন্ত পারদর্শিতার সংগে এই ব্যবস্থা করে দিল। বাকী বেগের মত সে প্রতিভাবান না হতে পারে, কিন্তু ছোটখাটো কৌশল এবং কায়দা কানুনে বেশ সিদ্ধহস্ত দেখলাম সে। সন্দেহের বিন্দুমাত্র ছায়াপাত ঘটতে দিল না।

কিন্তু আবদুল্লার কাছ থেকে সারা হিন্দুস্থানের যে সংবাদ পেলাম তাতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এই প্রথম তার কাছ থেকে জানলাম যে ওমরাহ্, রাজা এবং নবাবদের অধিকাংশই দারার প্রতি বিরূপ। একমাত্র যশোবন্ত সিং তাকে স্নেহ করেন। আবদুল্লা এই বিরূপতার কারণও বলতে দ্বিধা করল না।

—দারাশুকোর স্বভাবই এর জন্য দায়ী রাণাদিল্। তিনি ভাবেন তাঁর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হিন্দুস্থানে আর একজনও নেই।

—জানি আবদুল্লা! ভালোভাবে জানি। কিন্তু কী করব বলতে পারো ?

—না। তবে জেনে রেখো একমাত্র শাহানশাহ্‌র ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। সবাই দারাশুকোকে লোক দেখানো তোষামোদ করে,

আর তিনি মনে মনে ফুলে ফেঁপে ভাবেন এই তোষামোদ তাঁর ব্যক্তিত্ব আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যে প্রাপ্য।

—দারাকে এত সঠিক ভাবে তুমি কেমন করে বিচার করলে আবদুল্লা?

—সেকথা শুনে লাভ নেই রাণাদিল্।

—আচ্ছা, একজনও কি তাঁকে ভালবাসে না? একজনও কি তাঁর মন চিনল না?

—লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে ভালবাসে। কিন্তু তারা আমার মত অতি সাধারণ মানুষ। তখ্‌ত্‌তাউস রাখতে গেলে তাদের ভালবাসার দাম কানা-কড়িও নয়।

—তবু তারা ভালবাসে। দারাকে তারা ভালবাসে।

—তুমিও দেখছি আবেগের বাঁদী হয়ে উঠলে।

—হয়ত তাই। কিন্তু উপায় না থাকলে আমার সংগে দেখা করতে চাইলে কেন?

—এই সব বলতে। আমি জানি, বাদশাহ্‌জাদার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে, একমাত্র তুমি কিংবা নাদিরা বেগমই পারবে।

—বোধহয় তোমার ধারণা অত্যন্ত ভুল। তৈমুরলঙ-এর নাম শুনেছ আবদুল্লা?

—শুনব না?

—ওর ভেতরেও রয়েছে সুপ্ত এক তৈমুরলঙ। তেমনি জেদী, তেমনি উন্মত্ত। জেগে ওঠে সে মাঝে মাঝে। কিন্তু যোদ্ধা তৈমুরকে জাগাতে পারব না। আর পারব না নিষ্ঠুর তৈমুরকে জাগাতে।

—তোমার ভাগ্য। তবে মনে রেখো, অন্যান্য বাদশাহ্‌জাদাদের মনে রয়েছে তীব্র অসন্তোষ।

—কেন?

—সংগত কারণ রয়েছে। সোলেমান শুকো এখন কাবুলের শাসনকর্তা। তাছাড়া সে এখন বারো হাজারীর পদমর্যাদা পেয়েছে। সিপার পেয়েছে আট হাজারীর পদমর্যাদা। অথচ দেখ সুজা, আওরঙ্গজেব আর মুরাদের ছেলেদের দশা। তারা সবাই মিলেও সিপারের ধারে কাছে যেতে পারে না। ওঁরা কি আনন্দে দিন কাটাবেন?

—শাহানশাহ্‌ কেন যে এত পক্ষপাতিত্ব করেন বুঝি না।

—শাহানশাহ্‌ই ওঁদের মনে বেশী করে হিংসার বীজ বপন করে চলেছেন। ফল ভয়াবহ। শাহানশাহ্‌ আর কতদিন?

মতলব খাঁ ছুটে এসে বলে,—রোশেনারা বেগম আসছেন।

—কেন ?

—বলতে পারি না।

চোখের পলকে আবদুল্লা অন্তর্হিত হয়। মানুষটা ভেল্‌কী জানে নাকি ? তবু নিশ্চিন্ত হই।

বলি,—আবদুল্লা কোথায় গেল মতলব ?

মৃদু হেসে মতলব পাশের মসজিদের দ্বারের পাশটা দেখিয়ে দেয়। তবু দেখতে পাই না। তবে বুঝতে পারি আবদুল্লা সেখানেই রয়েছে।

রোশেনারা আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। তার মুখ দেখে বুঝতে পারি একটা কিছু ঘটে গিয়েছে।

—এই যে নর্তকী। তুমি এখানে জুটেছ ? যমুনার হাওয়া ঠাণ্ডা বুঝি খুব ?

জবাব দিই না।

—তুমি এখানে কেন মতলব খাঁ ?

—বেগমসাহেবা—

—বেগমসাহেবা ? বেগমসাহেবার সংগে দারার হারেমও এখানে চলে এসেছে নাকি ? আজই তোমায় তাড়াব।

আমি জবাব দিই,—সে চেষ্টা করে লাভ নেই। আমার নির্দেশে এসেছে।

—ও। তাই বুঝি ! নর্তকীর নির্দেশ ?

—হ্যাঁ। নর্তকী বৈকি। তবে একথা মনে রাখলে ভবিষ্যতে আপনার মংগল হবে যে আমিও বেগমসাহেবা। নৃত্য আর সংগীত আমার বাড়তি গুণ। আপনার কোন গুণই নেই। আছে শুধু দু এক সের তরল আগুন, যা আপনার জঘন্য ধমনীতে প্রবাহিত হতে হতে বিষে পরিণত হয়েছে।

—কী ?

—আঘাত করার চেষ্টা করবেন না। মতলব আমাকেই রক্ষা করবে। এর জন্যে আপনি আহত হলেও মতলবের গায়ে যাতে আঁচ না লাগে সেই ব্যবস্থা করতে আমি সক্ষম।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মতলবের দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রোশেনারা। শেষে বলে,—এতক্ষণে বুঝলাম, সব কিছুর মূলে রয়েছ তুমি আর এই বেয়াদপ মতলব। শাহনশাহ্‌কে খবর পাঠিয়ে এখানে এসে ভাল মানুষ সেজেছে।

—কী বলছেন ?

—জান না ? এখুনি হারেমে কি ঘটে গেল, জান না বলতে চাও ?

—আমি বহুক্ষণ হারেমে অনুপস্থিত।

—শাহানশাহ্‌কে কে খবর দিয়েছিল তবে?

—কিসের খবর?

—ন্যাকা সাজা হচ্ছে। আমার গোসলখানায় পুরুষ মানুষ লুকিয়ে ছিল এ খবর মতলব ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। সে বলেছে তোমাকে, তুমি বলেছ দারাকে। আর ওই কাফের শাহানশাহ্‌র কানে কথাটা তুলে দিয়েছে।

—দারা কাফের? ভাল কথা বলেছেন। আপনার মস্তিষ্ক ছাড়া এমন জিনিস আর কারও মাথা থেকে বার হওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা জেনে রাখুন, এমন একটা খবর জানা থাকলে দারাকে বলতাম না ঠিকই, কিন্তু জাহানারা বেগমকে নিশ্চয় বলতাম।

রোশেনারা চুপ করে যায়। তারপর আমাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পাশের মসজিদের দিকে ছুটে চলে। নিত্য নতুন পুরুষ সংগ্রহের জন্যে তার উদ্যমের শেষ নেই। একটিতে বিফল হলে, আর একটিতে সফল হবেই। এই-ভাবে তার দিন চলে উত্তেজনার ভেতর দিয়ে। এখানে তার আগমনের হেতু ওই ধরনেরই কিছু হবে। অন্য কোন পুরুষ কি তবে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কাছাকাছি কোথাও? আমাকে আর আবদুল্লাকে নির্জনে কথা বলতে দেখে রোশেনারাকে বলে দেবে না তো?

চাপা কণ্ঠে ডাকি আবদুল্লাকে। সে বার হয়ে আসে।

—আবদুল্লা, এখানে এসে আর কাউকে দেখতে পেয়েছ?

—হ্যাঁ।

রীতিমত ভীত হয়ে বলি,—দেখেছ? কোথায় সে?

—ওই মসজিদের ভেতরে সমাধির পাশে।

—ছি ছি, তবু তুমি আমাকে বললে না? সাবধান হলে না?

—ভয় নেই। লুকিয়ে বসেছিল সে। মুখে কাপড় গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এসেছি।

আশ্চর্য এই মানুষটি। যত দেখি ততই অবাক হই।

—আবদুল্লা, আমার নাচ দেখতে না পেয়ে, গান না শুনে তোমার বড় কষ্ট —তাই না?

—হ্যাঁ রাণাদিল্‌।

—সুযোগ পেলে তোমায় শোনাব—নিশ্চয় শোনাব। মনের অবস্থা যেমনই থাকুক। কিন্তু বয়েস যে বেড়ে যাচ্ছে! পারব তো?

—পারবে বৈকি? আগের মত বেশীক্ষণ হয়ত নাচতে পারবে না। দম

ফুরিয়ে আসবে। অভ্যাস করলে দমও ফিরে পাবে। তখন তোমার চরণের যাদুস্পর্শে পায়ের নীচে ধুলো পাগল হবে—আগুন ছিট্‌কোবে।

—আমি কথা দিলাম।

আবদুল্লা তড়িৎগতিতে অন্যদিকে চলে যায়। পরমুহূর্তেই দেখি রোশেনারা ফিরে আসছে। খুঁজে পায়নি বোধ হয় মনের মানুষকে।

মতলবকে বলি,—শিগগির চল। আর দেরী নয়।

রোশেনারা কাছাকাছি আসার আগেই রওনা হই। সে এসে পড়লে আর এক দৃশ্যের অবতারণা করত নিশ্চয়। মনের মানুষ তার হারিয়ে গিয়েছে। খুঁজে পেল না। জীবনের একটি রাত তার বিফলে যাবে।

হারেমে ফিরে ফতেমার কাছে সমস্ত কিছু শুনে তাজ্জব বনে যাই। সেই সংগে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করি মনে। হতভাগ্য সেই মানুষটি। দিল্লীর শাহানশাহ্‌র দুহিতাকে স্পর্শ করার কল্পনা সে জীবনেও করেনি। অথচ রোশেনারার উদগ্র লালসার শিকার হয়ে তাকে আসতে হয়েছিল তারই গোসলখানায়। স্নানের বিরাট জলাধার হয়েছিল তার লুকিয়ে থাকবার গোপন স্থান।

খবর চলে গিয়েছিল খোদ শাহ্‌জাহানের কাছে। তিনি একটু মজা করে গিয়েছেন। নিজে হারেমে প্রবেশ করে রোশেনারার কক্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে সস্নেহে ডাকলেন তাকে। ত্রস্তপদে বার হয়ে এল কম্পিত বক্ষে শাহ্‌জাহান দুহিতা।

—রোশেনারা, তোমার কি কোনরকম অসুবিধা আছে?

—না শাহানশাহ্‌। কেউ কি আপনাকে কিছু বলেছে?

—না। কাল গুলিস্তানে যখন বেড়াচ্ছিলে, তখন দূর থেকে তোমার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল বড়ই বিষাদময়।

—সন্ধ্যার আবছা আলোয় বোধহয় ভাল দেখতে পাননি। এই শীতের সন্ধ্যা বড় তাড়াতাড়ি নেমে আসে।

—তা ঠিক। একথা ভাবিনি। ভাবা উচিত ছিল।

—আমাকে দেখে এখন কেমন মনে হচ্ছে?

—বেশ ভালই। তবে—

—তবে কি?

—একটা অতৃপ্তি ভেসে উঠেছে তোমার মুখে।

রোশেনারা হেসে ওঠে। বলে,—এ আপনার স্নেহসিক্ত মনের কল্পনা।

—তা হবে—তা হবে। ঠিক বলেছ।

শাহানশাহ্ ধীরে ধীরে মাথা দোলান।

—শুধু এই সামান্য কারণে অসময়ে আপনি হারেমে এলেন?

—একে সামান্য বল?

—আমার কাছে সামান্য।

—চল, আমায় বসতে বলবে না?

—বসবেন? আপনার—

—না না। চল। এসেছি যখন দেখে যাই। বসে যাই একটু।

শাহানশাহ্ কক্ষে প্রবেশ করে এদিক ওদিক চেয়ে দু-চারটে মন্তব্য করলেন। শুনে ভালই লাগল রোশেনারার।

শেষে শাহ্‌জাহান বলেন,—চলতো তোমার, গোসলখানা দেখে আসি। নোংরা হয়ে নেই তো? সেদিন জাহানারার গোসলখানায় গিয়ে দেখি বিশ্রী হয়ে রয়েছে চারদিকে। শুনলাম সে নাকি কাউকে সাফ্ করতে ঢুকতে দেয় না। রাগ হয়েছিল। মুঘল হারেমের গোসলখানা সরাইখানার গোসলখানা নয়।

—আমি জাহানারা নই শাহানশাহ্। আমার গোসলখানা পরিষ্কার।

—তাই নাকি? খুশী হলাম। এই তো চাই। চল তো।

রোশেনারা দ্বিধাজড়িত চরণে শাহ্‌জাহানকে অনুসরণ করেছিল। তার পেছনে গিয়েছিল দুইজন খোজা।

শাহানশাহ্ স্নানাগারের খুব প্রশংসা করেন। রোশেনারার পিঠ চাপড়ে দেন। শেষে জলাধারে হাত দিয়ে বলে ওঠেন,—এই ঠাণ্ডার দিনে গরম জল রাখনি?

—না। আমি পছন্দ করি না—ঠাণ্ডা জলে আমার শরীর ভাল থাকে।

—না না। এ হতে পারে না। এই জন্যেই তোমাকে বিমর্ষ দেখতে লাগে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। না না, এ ঠিক নয়।

তিনি খোজা দুজনকে তখনি আদেশ দেন জলাধারের নীচে অগ্নি প্রজ্জলিত করতে।

তারা সংগে সংগে তৎপর হয়ে ওঠে, শাহানশাহ্ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আগুনের তেজ বাড়তে থাকে। জলাধারও উষ্ণ হয়ে ওঠে। তারপর ভেতরের জল গরম হতে থাকে। একটা অস্ফুট শব্দ সবার কানে গেলেও শাহানশাহ্ শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না।

রোশেনারা ছটফট করতে থাকে।

শাহানশাহ্ বলেন,—গরম তোমার সহ্য হচ্ছে না রোশেনারা?

—না। আর গরম করতে দেবেন না।

—তা হয় না। এই গরম জলে স্নান করে দেখ, শরীর কত সতেজ

মনে হবে।

—না—না।

—তুমি নিশ্চয়ই অবুঝ। এখন বড় হয়েছ, অমন করতে নেই।

জলাধার আরও তপ্ত হয়। শেষে ভেতরের জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে। তখন শাহানশাহ্‌ হেসে বলেন,—এইবারে স্নান কর। আরাম পাবে।

তিনি কক্ষ থেকে বার হয়ে যান।

রোশেনারা যখন যমুনার তীরে মসজিদের বাগিচায় নতুন শিকার সংগ্রহে রওনা হয়েছিল তখনো তার একদিনের পুরাতন প্রেমিকের অর্ধসিদ্ধ দেহ ফুটন্ত জলের মধ্যে একবার ওপরে ভেসে উঠছিল, আবার নীচে তলিয়ে যাচ্ছিল।

কড়া হুকুম দিয়ে গিয়েছিল রোশেনারা, ফিরে এসে যেন সে ওই বিকৃত মৃতদেহ না দেখতে পায়।

বুঝতে পারি, আমার প্রতি দারার প্রেম একেবারে শুকিয়ে যায়নি। তবু আগের সেই আগ্রহ, সেই উত্তেজনা না দেখতে পেয়ে মন শূন্য হয়ে যেতে থাকে। নিজের দেহকেও সব সময় ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়। কী অদ্ভুত এই নারী জীবন। প্রদীপ্ত যৌবন নিয়ে প্রেমিক যখন সোহাগে আদরে ভরিয়ে দিতে চায় তখন তীব্র আনন্দের মধ্যেও লজ্জা এসে সৃষ্টি করে এক অহেতুক ভীতি। সেই ভীতির ফলে মুখ থেকে উচ্চারিত হয় অনেক কিছু যা প্রেমিককে নিরুৎসাহ করে তুলতে প্ররোচিত করে। আবার সেই প্রেমিকই যখন সামান্য একটু অবহেলার ভাব দেখায় তখন মনের ভেতরটা গুম্‌ড়ে গুম্‌ড়ে ওঠে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলা যায় না। তাই ভাবি, পুরুষের জীবন কত সহজ কত বলিষ্ঠ।

দারা আমার কাছে বেশী আসে না আর। তাকে দোষ দিই না, সাম্রাজ্য নিয়ে সে ব্যস্ত। শাহানশাহ্‌র শরীর দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি কার্যত দারার হাতে হিন্দুস্থানের ভার তুলে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। এই সংবাদ এখনো সুজা মুরাদ আর আওরঙ্গজেবের কাছে গিয়ে পৌঁছায় নি। জানিনা তারা জানতে পারলে কি করবে।

আবদুল্লা যে সব খবর মাঝে মাঝে মতলব খাঁ মারফৎ আমার কাছে পৌঁছে দেয়, শুনে বুক কাঁপে। কত সময় ইচ্ছে হয় দারাকে সবকিছু খুলে বলি। কিন্তু সাহস হয় না। সেই সুপ্ত তৈমুর দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে, আমি কে? নর্তকী। সে তো সময় করে রাতে আমার কাছে আসে না বহুদিন। আমাকে কি আর চায় না সে?

কিন্তু সে এলো। রাতেই এলো আমার কাছে। শরীরের ভেতরটা কেমন

করে যেন। আনন্দে? তোমাদের এমন করে না? অনেকদিন পরে যদি আসে!

মুখ ফস্‌কে বার হয়ে যায়,—নাদিরা বেগমের শরীর ভাল আছে বাদশাহ্‌জাদা?

দারা থেমে যায়। আমার মুখের দিকে কেমন করে যেন চায়। সেই চাহনিতে তিরস্কার ছিল না এটুকু বুঝতে পারি। তোমরাও অমন চাহনি দেখেছ নিশ্চয়।

ছোট্ট প্রশ্ন করে সে,—অভিমান?

—না। অভিমানের মর্যাদা না থাকলে বড় বিড়ম্বনা।

দারা দ্রুত কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। পালংকের উপর বসিয়ে দেয়। নিজে পাশে বসে বলে,—মর্যাদা চিরকালই রয়েছে রাণাদিল্‌। তোমরা বড় অল্পে এটা-ওটা ভেবে নাও। নাদিরাও তাই। তুমি কি জান না হিন্দুস্থান এখন আসলে কে চালাচ্ছে?

—জানি। কিন্তু শাহানশাহ্‌রা কি তাঁদের বেগমদের কৃপা করতে ভুলে যান কাজের চাপে?

—তোমায় ভুলে যাব? বেশ, এমন কথা যদি তোমার মনে স্থান পেয়ে থাকে আমার বলার কিছু নেই।

সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে বসে। মুখ ভার। মান ভাঙার তাগিদ এবার আমার তরফ থেকেই হওয়া উচিত।

হেসে বলি,—ইস্‌, মুখ ভার করলে বাদশাহ্‌জাদাকে এখনো শিশুর মত দেখতে লাগে। ইচ্ছে হয়, আদর করে মুখে হাসি ফোটাই।

গম্ভীর স্বরে দারা বলে,—কে বাধা দিচ্ছে?

আমি হেসে উঠি। দারাও হাসে। সহজ হয়ে যাই দুজনা।

বহুদিন পরে মনে হয়, কান্দাহার অভিযানের পথে দারার সংগিনী আমি। এ যেন হারেম নয়, কোন এক পার্বত্য উপত্যকার টল্‌টলে সরোবরের তীরে আমাদের শিবির। দারা আর আমি। আমি আর দারা। শত চেষ্টাতেও নাদিরা এখানে এসে পৌছতে পারবে না।

—কি ভাবছ রাণাদিল্‌?

—কিছু না।

—এখনো সেই মিথ্যে কথা?

—এ মিথ্যায় বড় আনন্দ বাদশাহ্‌জাদা। বুঝবে না।

—বুঝতে চাই না। এটুকু অন্তত আমার কাছে রহস্য হয়ে থাক।

—তোমার অপার কৃপা।

—তাই বুঝি ?

—হুঁ।

—আর তোমার ?

—আমার কী ?

—কৃপা !

—তোমার প্রতি ?

—হ্যাঁ।

—ছি ছি। বলতে নেই।

—ঠিক বলছি।

—না।

—হ্যাঁ।

—তোমার শুধু গায়ের জোর।

—তোমার বুঝি রূপের ?

—জানি না যাও।

—গায়ের জোর পছন্দ কর না ?

—না করে উপায় আছে ? তুমি হলে সারা হিন্দুস্থানের—

দারা দুই হাতে আমার মুখ চেপে ধরে। তপ্ত নিঃশ্বাস তার বুঝিয়ে দেয় শরীরের শিরা উপশিরা কত চঞ্চল। আর আমার ? বহুদিন আগে যমুনার স্রোতে ভাসমান এক বিলাস। বজরার মধ্যে প্রথম তার সান্নিধ্যে এসে দেহ যেমন ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়েছিল, একটা শিরশিরে ভাব সমস্ত দেহটিকে পুষ্পাঞ্জলির মত সাজিয়ে তুলেছিল তেমনি ভাবে। আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয় দারার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল।

এরপর কত সময় চলে গেল—যে সময়ের হিসেব রাখা বৃথা।

বাইরে ফতেমা অতন্দ্র অবস্থায় রয়েছে জানি। দারাশুকো আমার কাছে সারারাত থাকবে। সে বেচারার ঘুম হবে না। না হোক। জেগে থাকুক একরাত ফতেমা। অনেক রাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে।

—রাণাদিল্।

—বল দারা।

—শাহানশাহ্ আজ আর শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেননি। দর্শনার্থীরা গবাক্ষের দিকে চেয়ে চেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে।

—জানতাম না তো ?

—সত্যিই তুমি জান না ?

—না।

—অথচ সারা শহরে রটে গিয়েছে শাহানশাহ্ মৃত।

—সে কি!

—আমি ভাবছি, এ খবর সুজাদের কানে গিয়ে পৌছলে ওরা কি স্থির হয়ে বসে থাকবে?

—কখনো না। কিন্তু তোমাকে আজ হোক, কাল হোক এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

—তা হবে।

—এর জন্যে প্রস্তুত আছো বাদশাহ্জাদা?

—নিশ্চয়।

—তবে ভাবছ কেন?

—ভাবছি, মিথ্যে ঘটনার জন্যে অশান্তির সৃষ্টি হবে।

—তখ্ত্তাউসে যে বসবে তার অশান্তির জন্যে ভাবনা?

—তুমি খুব বাস্তববাদী দেখছি।

—না দারা। আমার কীই বা বুদ্ধি। মনে যা হলো, তোমাকে বললাম।

—ভুল বলোনি রাণাদিল্।

দারার মেজাজ বুঝে আমি একটু অগ্রসর হতে চাইলাম। বললাম,—আচ্ছা, তোমার সব ওমরাহ্ আর রাজারাই কি বিশ্বস্ত?

—আলবৎ। তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে। জানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাদের চাইতে আমি অনেক উঁচুতে।

হা ঈশ্বর, সেই পুরোনো ব্যাধি এখনো যায়নি দেখছি। তেমনি অটল।

—এমন কি হতে পারে না যে শাহানশাহ্কে তুষ্ট রাখার জন্যে তোমার প্রতি আনুগত্যের অভিনয় করে তারা? সুযোগ পেলে অন্য দলে ভিড়বে?

—কখনো নয়। তুমি এ ব্যাপারে কী বুঝবে?

—সে তো একশোবার। তবু তুমি কৃপা করে আমার সংগে এ-বিষয়ে আলোচনা করছ বলে বলছি। কাসেম খাঁ, জয় সিং—এদের বিশ্বস্ত বলে মনে কর?

দারা ছিটকে দূরে সরে গিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—তুমি এত লোক থাকতে এদের নাম করলে কেন রাণাদিল্? কে তোমাকে এদের কথা বলেছে?

—কেউ না।

—নিশ্চয় কেউ বলেছে। রোশেনারা?

—তাঁর সংগে বাক্যালাপ নেই।

—কোন দুশমন্ এই কাজ করেছে কৌশলে। সব চাইতে বিশ্বস্ত যারা তাদের বিরুদ্ধে আমার মন বিষিয়ে তোলার জন্যে হায়েমকে ব্যবহার করছে। তুমি ফাঁদে পা দিওনা রাণাদিল্।

—না। তবে একটা কথা তো বিশ্বাস করবে? তোমার মংগল ছাড়া আর কিছু বুঝি না আমি?

—নিশ্চয়। তবে একথাও বিশ্বাস করি নারীর বুদ্ধি অনেক সময় মংগল করতে গিয়ে অমংগল ডেকে আনে।

—জানি দারা, জানি।

—আমি সুজাদের কথা এখন ভাবছি না। আয়োজন করে উঠতে ওদের সময় লাগবে। আমার ভাবনা হয়েছে শাহানশাহ্ যে জীবিত এই প্রমাণ কীভাবে দেব।

আমি হতাশা-জর্জরিত হৃদয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কাঁপা গলায় বলি,—আমি যা বলব, তা কি ঠিক হবে?

—কি বলবে তুমি?

—একটা উপায়। তবে সাহস হয় না। একে নারী, তার ওপর নবার-নন্দিনী নই—নর্তকী।

দারার মুখে একটা ছায়া নেমে আসে। সে বলে,—তুমি বল রাণাদিল্।

—আমাদের বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ খোজা আছে। যেমন ধর ফিরোজ হিলাল, উলফৎ, সাদিক। তাদের কেউ-ই খুব লম্বা নয়।

বিরক্ত দারা বলে,—এর মধ্যে খোজার কথা উঠছে কেন রাণাদিল্?

—বলছি। আচ্ছা নাদিরা বেগমের নিজের খোজা খাজা মকবুল তো বেশ লম্বা। তাতে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাতে কি?

—মকবুল শুনি ছেলে বেলা থেকে নাদিরা বেগমকে মানুষ করেছে। খুব বিশ্বস্ত।

—আঃ, দেখছি নিজের বুদ্ধির বহর দেখাতে উঠে পড়ে লেগেছ।

দারার অধৈর্যকে গুরুত্ব না দিয়ে আমি বলি,—লক্ষ্য করেছ বাদশাহ্-জাদা, তার চেহারার সংগে শাহানশাহ্র চেহারার একটা সাদৃশ্য রয়েছে? লক্ষ্য করেছ, দৈর্ঘে সে শাহানশাহ্র মতই হবে?

—কী বলতে চাও তুমি?

—মকবুলকে শাহানশাহ্র পোষাক পরিয়ে কিছুদিনের জন্যে গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে শিক্ষা দিন। শাহানশাহ

সুস্থ হবার আগে পর্যন্ত এইভাবেই চলতে পারে না ?

দারার চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সে আমায় ধরে বলে,—রাণাদিল্, তুমি অদ্ভুত। তুমি আমার কথায় কখনো রাগ করবে না বল ?

—না।

—কখনো না ?

—না।

—অনেক দুর্ভাবনা থেকে তুমি আমায় বাঁচালে। কালই সব ব্যবস্থা করছি।

—ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে এইভাবে যেন মাঝে মাঝে তোমাকে বাঁচাতে পারি বাদশাহ্জাদা। তাহলেই আমার জীবন সার্থক।

মনে মনে ভাবি পারব কি বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত ? ভাবতে শিউরে উঠি।

মকবুলের অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। দর্শনার্থীরা পরের দিন স্বয়ং শাহ্জাহানকে গবাক্ষের সামনে আবার দাঁড়াতে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। রাজধানীতে রটে গিয়েছিল শাহানশাহ্ আদৌ মৃত নন—তিনি রীতিমত জীবিত।

শাহানশাহ্ আরও কিছুদিন পরে শয্যা থেকে উঠে নিজে গবাক্ষের সামনে দাঁড়াবার শক্তি ফিরে পেলেও, পূর্বের স্বাস্থ্য তাঁর আর ফিরে এলো না।

সবচেয়ে মারাত্মক হলো শাহানশাহর মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে দেশের নানান্ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। দারার ভ্রাতাদের কানেও সেই সংবাদ গিয়ে পৌছল। কিন্তু সেটা যে ভিত্তিহীন এই খবরটা পৌছে দেবার মত আগ্রহ কারও দেখা গেল না। কিংবা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই পৌছে দিতে টালবাহানা করা হলো কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কলাকৌশলে।

ফলে পূবদিক থেকে সুজা এবং দক্ষিণ দিক থেকে আওরঙজেব সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করল। তখ্ত্তাউস, বিশেষ করে ময়ূর সিংহাসন মোগলাই-খানা নয় যে গিলে ফেললেই হজম হয়ে যাবে।

দারার নিশ্চিন্তভাব দেখে একদিন অতি কৌশলে তাকে প্রস্তুত থাকার জন্যে বললাম। সে এক অদ্ভুত অবহেলা-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

ছুটে নাদিরার কাছে গেলাম সমস্ত সৌজন্য জলাঞ্জলি দিয়ে। নাদিরাও দেখি আমার মতই চিন্তিত।

সে বলল,—অনেক চেষ্টা করেছি। তোমার মত অতটা অবহেলা আমায় দেখায় নি বটে, তবে দেখালেই ভাল হত।

—কেন ?

—বুঝতে পারতাম নিজের থেকে সচেষ্ট হয়েছে।

—এতটা নিশ্চিন্ত কেন বেগমসাহেবা ?

নাদিরা অবিশ্বাস্য রকমের বিদ্রূপ ও বিষাদমাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—জান না বুঝি ?

—না।

—দারাশুকো তো তার ভবিষ্যৎ জেনে বসে আছে।

মাথায় আমার যেন বজ্রাঘাত হয়। আবার সেই ফকির, সেই জ্যোতিষী ?

নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে,—কী সেই ভবিষ্যৎ ?

—শাহানশাহ্ শাহ্জাহান যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন যে-কেউ তখ্ত্তাউস দখলের চেষ্টা করলেই তার সৈন্য বাহিনী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর সে বিতাড়িত হয়ে রাজস্থানের পাহাড়ে জংগলে কিংবা মরু প্রান্তরে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াবে সামান্য একটু আশ্রয়ের খোঁজে।

—চমৎকার। বাদশাহ্র মনের কথাই বলে ফেলেছেন ওঁরা।

অক্ষম ক্রোধ আর আক্ষেপের সংগে নাদিরা বলে ওঠে,—যা বলেছ।

—কিন্তু শাহ্জাহানের পরমায়ু কত সে খবর কি ওঁরা জানেন ? সেকথা কি বাদশাহ্জাদাকে বলা হয়েছে ?

—হ্যাঁ। তাও বলেছেন। অনেক—অনেক—

আমি কিছুক্ষণ ঝিম্ ধরে থাকি। তারপর নাদিরা বেগমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুরতেই দেখি দ্বারপ্রান্তে বাদশাহ্-বেগম জাহানারা দাঁড়িয়ে।

—তুমি এখানে ?

—একটু দরকারে এসেছিলাম বেগমসাহেবা।

—দুজনার মধ্যে বেশ সদ্ভাব রয়েছে দেখছি।

এবারে নাদিরা জবাব দেয়,—রাণাদিলের সংগে অসদ্ভাব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ওকে যদি জানতেন—

—জানি বৈকি কিছু কিছু।

—কিন্তু আপনি এ-সময়ে বাদশাহ্-বেগম ?

—দারাকে খুঁজে পাচ্ছিনা। শুনলাম হারেমের দিকে এসেছে।

আমরা উভয়েই এক সংগে বলে উঠি,—হারেমে ?

—কেন তোমরা জান না ?

নাদিরা উত্তর দেয়,—না তো ?

—তুমি রাণাদিল্ ?

—আমিও জানি না।

—কোথায় গেল তবে?

নাদিরা প্রশ্ন করে,—কেন খুঁজছেন তাঁকে?

—তোমরা বুঝবে না। তোমরা শুধু হারেম চেন। কোন্ বেগম আফিমের মাত্রা কতটা বাড়িয়েছে, কোন্ বেগমের ঘরে পালংকের নীচে স্বাস্থ্যবান যুবক লুকিয়ে রয়েছে এ খবরও তোমরা দিতে পার। কিন্তু দেশের কোন্ প্রান্তে কী ঘটতে চলেছে তোমরা জান না। জানার অবশ্য প্রয়োজন নেই। তবে তেমন ইচ্ছাও হারেমবাসী কারও থাকে না। তাই তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই।

মনে মনে ভাবি নাদিরা বেগমের কথা বলতে পারি না, তবে আবদুল্লা আর মতলব খাঁয়ের দৌলতে দেশের অনেক গোপনীয় সংবাদই আমার জানা। এমন সব খবর আমি জানি, পরাক্রান্ত জাহানারা বেগম তাঁর অর্থপুষ্ট চরদের সাহায্যে সেই খবর জোটাতে পারবেন না।

জাহানারা বেগম বিদায় নেবার উদ্যোগ করতে আমি বিনীতভাবে বলি,—আমার একটা প্রার্থনা রয়েছে বেগমসাহেবা। দয়া করে আপনি সেটি নিজে দেখলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

নাদিরার চোখে বিস্ময়। জাহানারার মুখে একটা অস্পষ্ট ক্রোধ।

—বল রাণাদিল্।

—বাদশাহ্‌জাদা সুজা এলাহাবাদের দিকে এগিয়ে আসবেন শীগগিরই। দয়া করে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন অবিলম্বে। আমি এসব কথা আপনার ভাইকে বললে তিনি আমার গর্দান নেবেন। অথচ যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, চুপ করে বসে থাকতে পারি না। বিশ্বাসঘাতকরা মাথা চাড়া দিচ্ছে জানেন কি? অনুগ্রহ করে রাজা জয়সিংহকে সুজার বিরুদ্ধে এলাহাবাদে পাঠাবেন না।

জাহানারার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা একটু ঝুলে পড়ে। চোখের দৃষ্টির তীক্ষ্নতা অদৃশ্য হয়। তিনি কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারেন না। শেষে অতিকষ্টে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠেন,—তুমি! রাণাদিল্—

—আমায় মাফ্ করবেন। তবে জয়সিংহ আস্থাভাজন হবেন না।

হাত উঁচু করে জাহানারা আমায় থামতে বলেন। তারপর প্রশ্ন করেন,—সুজা যে এলাহাবাদের দিকে এগিয়ে আসবে এ খবর তোমায় দিল কে?

—আমি পেয়েছি।

—হারেমে এ-ভাবে খবর আদান-প্রদান হয়?

—নিজের স্বার্থ এবং দারাশুকোর মংগলের জন্যে সবই করতে হয়। নইলে

বেগমসাহেবাদের :আফিমের মাত্রা কমা বাড়ার খবর ছাড়া যে আর কিছুই জানবার থাকে না।

জাহানারা ঢোক গেলেন। এই অপমান তিনি গায়ে না মেখে প্রশ্ন করেন,—অত দূরের খবর কি করে এল তোমার কাছে? আমি তো এখনো পাই নি। আমি এখনো জানি না সুজা এলাহাবাদ আক্রমণ করতে মনস্থ করেছে।

—তাহলে অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন বেগমসাহেবা। নইলে মুশকিল হবে।

—তুমি সত্যিই আশ্চর্য রাণাদিল্।

জাহানারা চলে যান। নাদিরা এগিয়ে এসে আমার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করে বলে,—আমিও জাহানারার মত বলছি, তুমি সত্যিই আশ্চর্য রাণাদিল্।

—এভাবে বললে লজ্জা পাই বেগমসাহেবা। বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। চিন্তায় ভাগীদার নেই আমার। বাদশাহ্জাদা শুনতে চান না।

—পৃথিবীতে একজন অন্তত তোমার সুখদুঃখের ভাগীদার।

—জানি। তবু সব খবর পেয়েও অক্ষমের মত চুপচাপ বসে থাকার বড় জ্বালা।

একটু ভেবে নিয়ে নাদিরা বলে,—জাহানারা বেগমের তোমার ওপর আস্থা হয়েছে। তাঁকে কাজে লাগাও।

কথাটা মন্দ বলেনি নাদিরা। খাঁটি কথাই বলেছে। জাহানারা বেগম সর্ববিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। দারা তাঁর মতামত চট্ করে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

দারাশুকোর নিষ্ফলা অহমিকায় এতটুকুও ফাটল ধরল না জাহানারার শত অনুরোধেও। ফকিরসাহেবদের ভবিষ্যৎ-বাণী তাঁর কাছে ঈশ্বরের বাণীর মত অনিবার্য।

জাহানারা বেগমকে এতটা উতলা হতে আমি আগে কখনো দেখিনি। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে দারার বেপরোয়া পাগলামী ধরা পড়ে গিয়েছে।

ওদিকে শাহানশাহ্ আবার দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন দিনের পর দিন। মানসিক অশান্তি তাঁকে ক্ষয় করে ফেলেছে। জাহানারা বেগমের সেবাও তাঁর স্বাস্থ্যের এতটুকু উন্নতি ঘটাতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত জাহানারা বেগম একদিন নাদিরা এবং আমার সামনেই দারাকে বলেন,—শাহানশাহ্র একান্ত ইচ্ছা রক্তপাত না ঘটে।

দারা জলে ওঠে,—আমি ঘটাচ্ছি বলতে চাও? ওরা যদি ঘটাতে চায় আমি কি করে বন্ধ করব?

—আমার কথা একটু শুনলে এমনটি হতো না।

—তোমার কথা শুনলে মুঘলবংশ থেকে দারাশুকোর নাম এতদিন মুছে যেত।

জাহানারা চিৎকার করে ওঠেন,—দারাশুকো? এতদূর?

এত ক্রোধান্বিত হতে বাদশাহ্‌বেগমকে কখনো দেখিনি। দারাশুকো চমকে ওঠে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সে হেসে বলে,—আমি জানি তোমার মন ভাল নেই জাহানারা। বুন্দেলরাজকে আওরঙজেবের বিরুদ্ধে যেতে আমি বলিনি।

জাহানারা আরক্তিম হয়ে ওঠেন। এতে লজ্জা ছিল না এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ছিল দারার প্রতি একটা বাঁধভাঙা ঘৃণা। তাঁর সবচেয়ে স্নেহের ব্যক্তিটি চরম অপমান করেছে তাঁকে।

অদ্ভুত সংযমের সংগে জাহানারা নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলে বলেন,—তোমার ওই ঘৃণিত কথার জবাব আমি দিতে চাইনা। তবে একটা কথা ভাল ভাবে জেনে রেখো, তোমার সামনে এই মুহূর্তে যে তিনজন দাঁড়িয়ে রয়েছে এরা ছাড়া এই হারেমে তোমার মংগলাকাঙ্ক্ষী আর একটি প্রাণীও নেই। গোটা কিল্লায় যদি আর কেউ থাকেন, তিনি শয্যাশায়ী।

দারা হো হো করে হেসে ওঠে। এই হাসি জীবনে আমি মাত্র আর একটিবার শুনেছিলাম।

জাহানারা কাটা কাটা কথা বলেন,—তোমার ওই অবুঝ হাসি প্রমাণ করে তখ্‌ত্‌তাউসে বসবার তুমি কত অনুপযুক্ত। তবু তোমার পক্ষেই আমি রইলাম। বুন্দেলরাজের নামে খোঁচা দিলেও আমি তোমার দলে। কারণ শাহানশাহ্‌র স্নেহ তোমার প্রতি সব চাইতে বেশী।

—আর কিছু নয়? বুন্দেলরাজের আমি প্রিয় পাত্র বলে?

—তোমার মুখে এত হীন কথা শোভা পায় না। তোমার মন সংস্কৃতি সম্পন্ন। হয়ত এ তোমার বুদ্ধিভ্রংশ। বিপদের দিনে এর দরুন পতন ঘটে। শোন দারা, শাহানশাহ্‌ এখনো দেহত্যাগ করেননি। তিনি ইচ্ছে করলে তখ্‌ত্‌তাউসে অন্য কোন পুত্রকে বসাতে পারেন। ইচ্ছার এই পরিবর্তনটুকু আমি অনায়াসেই ঘটাতে পারি। কারণ তুমি তাঁর প্রিয়তম পুত্র হলেও, আমার কথার গুরুত্ব তাঁর কাছে সব চাইতে বেশী। আর তাঁর এই ইচ্ছার কথা হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা জানতে পারলে তুমি খড়কুটোর মত উড়ে যাবে।

—চেষ্টা কর।

—সেইটাই আমার দুর্বলতা। এই দুর্বলতার কথা তুমি ভালভাবে জানো। আর জানো বলেই আমার সম্মানে আঘাত করতে তোমার এতটুকুও দ্বিধা নেই। না, আমি কিছু করব না। নিজের আত্মম্ভরিতা নিয়েই তোমার পতন হোক।

—কি বললে ?

—তোমার পতন হবে। শুধু আমি কেন ? নাদিরাকে প্রশ্ন কর—রাণাদিল্‌কে প্রশ্ন কর। তারাও একই কথা বলবে।

—শেষে হারেমে আমার ভাগ্য নির্ধারিত হবে বলছ ?

—না। ভাগ্য তোমার নির্ধারিত হবে হারেমের বাইরে। সুজা, মুরাদ আর আওরঙজেব অত সুখ তোমায় দেবে না। তোমার বিরুদ্ধে কোথায় কোন্‌ ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেই খবর শুধু তুমি কেন আমার চেয়েও ভাল জানে এই রাণাদিল্‌।

—রাণাদিল্‌ ?

—হ্যাঁ। সুজা এলাহাবাদ আক্রমণ করবে কবে বলেছিলাম ?

—মিথ্যে কথা। সে এলাহাবাদ আক্রমণ করতে পারেনা। তার কাছে পত্র পাঠিয়েছি। মুংগের দুর্গ তাকে আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু একটি সর্তে। সৈন্যবাহিনী তাকে ভেঙে দিতে হবে। আর মুংগেরে তার কোন পুত্রকে রাখা চলবে না। আমার প্রস্তাব লুফে নেবে সুজা।

এবারে আমি বলি,—না। এলাহাবাদে তিনি আসবেনই।

—তুমি ? তুমি রাণাদিল্‌ ? এতটা বেড়ে উঠেছ ? আমার কথার ওপর কথা বলতে সাহস পাও ?

জাহানারা বলেন,—সাচ্চা খবর পেলে সাহসের প্রশ্ন ওঠে না।

—সবাই দেখছি এক একজন যুদ্ধবিশারদ বনে গিয়েছ তোমরা ? পথের নর্তকীও শেষে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ বলে দেয়।

আমার মাথার ভেতরে কেমন করে ওঠে। জীবনে এই প্রথম দারা আমায় এমনভাবে অপমানিত করল। এত মান-অভিমান, এত রাগ-বিরাগের মধ্যেও এমন নগ্নভাবে আমাকে আর কখনো আক্রমণ করেনি সে। ঝাপ্‌সা দৃষ্টির ভেতর দিয়ে দারার মুখখানাকে অবিকল রোশেনারার মুখের মত দেখতে লাগে। তেমনি ক্রুর। সর্বাংগ কেমন দুর্বল বলে মনে হয়।

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি মনে মনে। আর কখনো উপযাচক হয়ে দারাকে কিছু বলব না। কাউকে বলব না—নাদিরা জাহানারাকেও নয়। আবদুল্লা যে সমস্ত খবর আমার কাছে পৌছে দেবে, গোপন রাখব। লাভ

নেই। আবদুল্লার প্রাণান্তকর পরিশ্রম আর ঝুঁকির কোন মূল্যই নেই। চেষ্টা করব আবদুল্লাকে নিবৃত্ত করতে। সে মানবে না জানি। কারণ তার বিশ্বাস, গোপন সংবাদ দারার কাছে পৌঁছে দিতে পারলে দারা নিশ্চয়ই গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। ব্যবস্থাও নেবে সেই অনুযায়ী। বৃথা—সব বৃথা।

আমি নর্তকী। সত্যিই তো আমি নর্তকী। দারা কিছু অন্যায় বলেনি। আজ থেকে আমার কক্ষে শুরু হবে আবার নৃত্যের অনুশীলন। আবদুল্লার কাছে প্রমাণ দিতে হবে বয়স বেড়ে গেলেও নর্তকী রাণাদিলের মৃত্যু হয়নি। হতে পারে না। গায়িকা রাণাদিলের সুরেলা কণ্ঠ একটু গম্ভীর হলেও এখনো মোহজাল বিস্তার করতে সক্ষম।

আমি নর্তকী—আমি—

—রাণাদিল্?

কে যেন আমায় ডাকে। ও জাহানারা বেগম। আমি তো হারেমেই আছি। সামনে রোশেনারার মত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে দারা। আর ওপাশে নিষ্কলংক ফুলের মত নাদিরার মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জবাব দিতে দেরী হলেও, অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল কণ্ঠে জবাব দিই,—বাদশাহ্-বেগম?

এত বুদ্ধিমতী এত রূপসী এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েও এমন ভদ্র মহিলা হারেমে দ্বিতীয় নেই।

—তোমার মূল্য মূর্খেরা না বুঝলেও আমি বুঝি রাণাদিল্। তুমি আঘাত পেয়েছ। দুঃখ কোরো না তাতে। আমিও কি কম আঘাত পেলাম?

উত্তর দিতে পারি না। চুপ করে থাকি। দারাকে আমি আর আমার কক্ষে আসার অনুরোধ করব না কখনো। প্রার্থনা জানিয়ে ফতেমাকে পাঠাব না। সে নিজের ইচ্ছায় কখনো যদি আসে আসুক।

—রাণাদিল্।

—বেগমসাহেবা আমাকে যেতে অনুমতি দিন।

—বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তুমি যাও। আমিও চললাম।

নিজের কক্ষের দিকে যেতে থাকি। দারার উক্তি মনের মধ্যে বার বার অনুরণিত হয়। সে আমাকে ঘৃণা করে। সে আমাকে নর্তকী বলেছে ঘৃণিত কণ্ঠে। সে আমায় তবে আর ভালোবাসে না। বাসলে এভাবে কথাটা উচ্চারিত করতে পারত না।

নাদিরা বেগম ছুটে এসে আমাকে বলে,—তুমি দারার কথায় ভুল বুঝো না রাণাদিল্। অহমিকা ওকে অন্ধ করে, ক্ষিপ্ত করে। তখন ও নিষ্ঠুরভাবে

আঘাত করতে থাকে। ভালোবাসা ওর সই। মুহূর্তের জন্যে শুকিয়ে যায়। তুমি তো সবই জান। আমার চেয়ে হয়ত ভালই জান।

নাদিরার কথা আমার মনে এতটুকুও সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে না।

সেই রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

দিগন্তবিস্তৃত তপ্ত মরু-প্রান্তরের প্রান্তসীমায় ক্ষুদ্র পাহাড়ের কোণে ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের এক কুটির। সেই কুটিরে রয়েছি আমি—এই রাণাদিল্। সেখানে আমি আমার পিতামাতার আদরের দুলালী। আর রয়েছে আমার এক কিশোর ভাই। ঋজু তার দেহ, উন্নত নাসিকা, দীঘল চোখ।

কী শান্তি, কী আনন্দ! আমি যে গোত্রহীন এক নর্তকী সে কথা জানি না। এই জীবন আমার কল্পনার বাইরে। হারেম কাকে বলে জানি না—ঐশ্বর্যের স্তূপ কখনো দেখিনি।

তবু কী অনাস্বাদিত পুলক। ভাই-এর হাত ধরে পাহাড়ী পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। দূর থেকে মা আমার নাম ধরে ডাকেন। ছুটে যাই আমরা ভাই-বোনে মিলে।

মা তাঁর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে আমাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। আমার চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে।

মা বলেন,—আজ আর তুই পথে পথে ঘুরিস না।

—কেন মা?

—আজ আমাদের একটা ব্রত পালন করতে হবে যে।

আমার কিশোর ভাইটি বলে ওঠে,—কোন্ ব্রত মা?

—তোর ওসব কথা শুনে কি হবে? তুই খেলতে যা তো?

—বাঃ, আমি বুঝি এখনো ছেলেমানুষ আছি?

মা হেসে বলেন,—না-রে। ছেলেমানুষ হবি কেন? কিন্তু তুই পুরুষ মানুষ। তোদের একটি ব্রতই শুধু আছে।

—কোন্ ব্রত মা?

—যুদ্ধ। দেশ আর মেয়েদের সম্মান রাখতে যুদ্ধ করাই তোদের ব্রত।

ভাই-এর মুখের দিকে চেয়ে দেখি গর্বে সেই মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

সে বলে,—ঠিক আছে। আমি খেলতে যাচ্ছি।

মা তার যাওয়ার পথে চেয়ে থাকেন।

আমি বলি,—কিসের ব্রত মা?

—আজকের দিনে এই বংশের এক বধূ আগুনে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। নাম তাঁর কলাবতী।

—কেন ?

—নারীত্বের প্রতি অপমানের জন্যে। তাঁর স্বামী তাঁর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। অথচ সবটা ঘটেছিল কলাবতীর স্বামীর রাগের জন্যে। নইলে স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তবু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ওই ধরনের মন্তব্য করে ফেলেছিলেন তিনি। পরে তিনি বারবার নিজের ভুল স্বীকার করেও কলাবতীকে টলাতে পারেন নি। তিনি স্বামীর হাত ধরে সজল কণ্ঠে অথচ দৃঢ়তার সংগে বলেছিলেন যে, কোন উপায় নেই। কারণ তাঁর নিজের জন্যে শুধু নয়, সতীত্বের মর্যাদা রাখতে আত্মবিসর্জন দিতেই হবে তাঁকে। আজই হলো সেই দিন।

আমি আর মা সেই ব্রত পালন করলাম। উভয়ে একসংগে আউড়ে গেলাম,—নারীত্বের মর্যাদা রাখতে প্রাণ দেব। সতীত্ব রাখতে একবিন্দু দ্বিধা বোধ করব না। প্রাণ তুচ্ছ—সতীত্ব বড়।

মাকে প্রশ্ন করেছিলাম,—এই ব্রতের ফল কি মা ?

স্বর্গীয় হাসি হেসে মা বলেছিলেন;—এর ফলের কথা কি অল্পে বলা যায় ? তবে এটুকু মনে রাখিস, এই ব্রত পালন করায় এই বংশের কোন মেয়ে মনে মনেও দ্বিচারিণী হয় না। এই বংশের কোন মেয়ে সতীত্বের অবমাননা সয়ে বেঁচে থাকে না। সে জানুক আর না-ই জানুক তার রক্তের মধ্য দিয়ে এই ধারা বংশের পর বংশ প্রবাহিত হয়ে যাবে!

ঘুম ভাঙতেই শিশুর মত কেঁদে উঠি। আমি আমার মাকে হারালাম। আমার ভাইকে হারালাম। স্বপ্ন কেন সত্যি হয় না ঈশ্বর। মায়ের মমতাময় মুহূর্তের আস্বাদন জীবনে যে কখনো পাইনি!

কিন্তু কী দেখলাম এ-সব ? এর মানে কি ? আবার সেই মরুভূমি। বহু বছর আগে দু-একবার দেখেছিলাম বটে। আমি কি মরুভূমির কথা অবচেতন মনে চিন্তা করি কখনো ? জানি না।

সুজা এগিয়ে আসে। দারার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসে সে এলাহাবাদেরই দিকে। সংগে তার বিরাট বাহিনী।

দারা শুনলাম আবার ফকির সাহেবদের নিয়ে বসার উদ্যোগ আয়োজন করছে। করুক। আমার বলার কিছু নেই। আমি নর্তকী। নবাব বাদশাহ্‌দের কাছে নর্তকীরা সামান্য বৈকি। কারণ তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরই অনুগ্রহে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। কিন্তু সেদিন

দারার চোখেমুখে নর্তকী শুধু সামান্ত নয়—ঘৃণিত হয়ে উঠেছিল। তাই উপযাচক হয়ে দারার কাজে বাধা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। এখন শুধু চোখের জলই ফেলতে হবে।

কিন্তু দারার ফকির সাহেবদের নিয়ে আসার উদ্যোগ সফল হয় না জাহানারা বেগমের তৎপরতায়। এই প্রথম বাদশাহ্-বেগম নিজস্ব ক্ষমতা বলে ফকিরী বৈঠক বাতিল করে দেন। এতদিন তিনি ছিলেন স্নেহপরায়ণী ভগিনী। এবারে তিনি কর্তব্য-কঠোর বাদশাহ্-বেগম। তাই নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এতদিন সবাই ভুলে গিয়েছিল যে হারেম তো বটেই, এমনকি অন্যান্য ক্ষেত্রেও জাহানারার ক্ষমতা দারাশুকোর চেয়ে কোন অংশে কম নয়—বরং দু-একটি ব্যাপারে বেশীই।

শুনলাম দারার ক্রোধ হতাশায় পরিণত হয়েছে। সে জাহানারার কাছে অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবর্তে, জাহানারা সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়েছেন।

আমার মনের ভেতরে আবার আশার আলো জলে ওঠে। মনে মনে প্রার্থনা করি, জাহানারা বেগম যেন এমনি শক্তভাবে লাগাম ধরে রাখতে পারেন।

দারার পুত্র সুলেমান শুকো যুদ্ধযাত্রা করে পরের দিনই।

কয়েকদিনের মধ্যে আবদুল্লা প্রথম সংবাদ দিল যুদ্ধের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে। খুবই শুভ সেই সংবাদ। আবদুল্লা একটি ছোট্ট মন্তব্যও করেছে। সে বলেছে, সুলেমানের বুদ্ধি, সাহস আর কৌশল অত্যন্ত উচ্চস্তরের। দারাশুকোর পরিবর্তে যদি শাহানশাহ্ এই মুহূর্তে তাকে তখ্‌ত্‌তাউসে বসার জন্যে মনোনীত করেন তাহলে সুজা আর আওরঙজেবের শত-সহস্র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মন্তব্যটি অত্যন্ত রূঢ় হয়ে বাজল আমার বুকে! রূঢ় এই কারণে যে দারাকে সে হেয় করেছে। তবু সুখ অনুভব করি সুলেমানের জন্যে। সে দারারই পুত্র। আমার গর্ভজাত না হলেও দারারই শোণিত তার ধমনীতে প্রবাহিত।

দুদিন পরেই আবার একটি সংবাদ। সুজা পরাজিত। সে পাটনার দিকে দ্রুত পিছু হটে যাচ্ছে। সুলেমানের আক্রমণের তীব্রতা তার মত যোদ্ধাও সহ্য করতে পারেনি।

আত্মহারা হয়ে কক্ষ থেকে ছুটে বের হয়ে এলাম। কোথায় দারা? এখুনি তাকে সংবাদটি দিতে হবে।

ফতেমা সামনে এসে বলে,—কোথায় চলেছেন বেগমসাহেবা?

—পথ ছাড়ো দারার কাছে যাব।

ফতেমা চিন্তিত হয়। কারণ উত্তেজনায় আমার মনে না থাকলেও সে জানে

কিছুদিন থেকে আমি নিভৃতে অশ্রু বসর্জন করে চলেছি। সে একথাও জানে দারার ব্যবহারে আমি নিদারুণভাবে আহত।

—সত্যিই যাবেন ?

—তার মানে ? কী বলতে চাইছ ফতেমা ?

আমার উক্তি শেষ হবার আগেই সব কথা মনে পড়ে যায়। আমি তো নর্তকী। দারা তখ্‌ত্‌তাউসের ভাবী উত্তরাধিকারী। সে আমার কাছে আর আসেনা। আমার খোঁজও নেয়না। আরও কিছুদিন দেখার পরে ছুটি চাইব তার কাছ থেকে। চলে যাব হারেম ছেড়ে। তার প্রয়োজনেই আমি হারেমে রয়েছি। সে আমাকে বেগমসাহেবা করেছে অনুগ্রহ করে। কিন্তু সে তো ভোলেনি আমি কে ? আমিও ভুলিনি। আবদুল্লা আমাকে ভুলতে দেয়নি।

—আমার ভুল হয়েছিল ফতেমা। মস্ত ভুল হয়েছিল।

পেছন থেকে প্রশ্ন আসে,—কী ভুল হয়েছিল রাণাদিল্‌ ?

জাহানারা বেগম ! তিনি এদিকেই আসছিলেন। তাঁর মুখে চিন্তার রেখা। ভাবলাম, বুন্দেলরাজের জন্য বুঝিবা। তিনি আওরঙজেবের সংগে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে গিয়েছেন। ওদিকের খবর আমার জানা নেই। আবদুল্লা জানায়নি কিছু। হয়ত তারা আরও দূরে রয়েছে বলে।

লজ্জিত হয়ে বলি,—কিছু নয় বেগমসাহেবা।

—আপত্তি থাকলে বোলো না। এলাহাবাদের খবর না পেয়ে বড় চিন্তিত আছি। তোমার তো অনেক খবর জানা থাকে শুনি।

—ভাববেন না। বাদশাহ্‌জাদা সুজা পরাজিত। পাটনার দিকে পালাচ্ছেন।

জাহানারা বেগম শক্ত হাতে আমাকে চেপে ধরেন। অদ্ভুত গলায় বলেন, —সত্যি ?

—হ্যাঁ।

—আর কি খবর ? বল—বল রাণাদিল্‌।

—দিলীর খাঁ আর জয়সিংহ ঠিক সময়েই সুলেমানের সংগে মিলিত হয়েছিল।

—আর—আর ?

—এখনো পাইনি। তবে এবারে অশুভ কোন সংবাদের অপেক্ষায় আছি।

—অশুভ ?

—হ্যাঁ।

—একথা বলছ কেন ?

—আমি অনেকদিন আগেই বাদশাহ্‌জাদাকে বলেছিলাম, জয়সিংকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব না দিতে।

—জয়সিং কিন্তু আমার মনে হয় চমৎকার ব্যক্তি।

—না। সে ভণ্ড।

—তোমার এই কথায় আমার ধৈর্য রাখা কখনই সম্ভব হতো না, যদি না জানতাম তোমার খবরগুলো সাধারণত খুবই পাকা। মনে রেখো জয়সিং এ পর্যন্ত কখনো বিশ্বাসভংগ করেনি।

—আমার ভুল হলে আনন্দ আমারই সব চেয়ে বেশী হবে।

—বেশ। আর কি খবর ?

—আপনার ভাই শাহানশাহ্‌র নামে মীর্জা রাজিবের কাছে যে পত্র দিয়েছেন তার ফলাফল কী হবে বলতে পারি না।

—দারা পত্র দিয়েছে ? জানিনা তো ? কি লিখেছে ?

—লিখেছেন, বে-আদপ সুজার কাটামুণ্ড যেন শাহানশাহ্‌র কাছে পাঠানো হয়। শাহানশাহ্‌র একান্ত ইচ্ছা তাই।

জাহানারা বেগম চমকে ওঠেন ! কারণ শাহানশাহ্‌র রক্তপাতে অনিচ্ছার কথা সবার জানা। বিশেষ করে নিজ পুত্রদের মধ্যে।

জাহানারা বেশ উত্তেজিত। তিনি আমার উপস্থিতির কথা ভুলে যান। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে থাকেন। আমি যেতে দিই না। সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিই। তিনি দারার কাছে যেতে চান এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—কী বলতে চাইছ রাণাদিল্ ?

—আপনি বাদশাহ্‌জাদার কাছে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমার নাম উল্লেখ করবেন না দয়া করে। সেদিন তো দেখলেন আমি কত ঘৃণিত।

জাহানারা বেগমের দৃষ্টি কোমল হয়। তিনি শান্ত কণ্ঠে বলেন,—মনে রাখব রাণাদিল্, তুমি একজন নর্তকী। যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা যার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

জাহানারা বেগম চলে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন বাঁদী এসে জানালো মতলব খাঁ আমার দর্শনপ্রার্থী। এগিয়ে গেলাম ঝরোখার কাছে। আবার খবর নিশ্চয়। আবদুল্লার দল দিনরাত সমানে পাগলের মত কাজ করে চলেছে। তারা জানে না তাদের এই পরিশ্রমের বারুদভর্তি গোলা জলে এসে পড়েছে। কষ্ট হয়। অনুশোচনা হয়। তবু জাহানারা বেগমকে বলে

যদি কোন সুফল ফলে।

মতলব বলে,—জয়সিং সুলেমান শুকোর হুকুম অমান্য করেছে। সুজার পেছনে ধাওয়া করতে বলা হয়েছিল তাকে। সে যায়নি।

শেষ পর্যন্ত আবদুল্লার কথাই সত্যে পরিণত হলো। আমি নিঃসংশয় ছিলাম। কারণ আবদুল্লা একজন অসাধারণ ব্যক্তি।

মতলব আর একটি সংবাদ দেয়। এই প্রথম আবদুল্লা আওরঙজেব সম্বন্ধে জানালো। ধর্মতের যুদ্ধে যশোবন্ত সিং আওরঙজেবের কাছে পরাজিত। যশোবন্ত সিং যোধপুরের দিকে পালিয়েছেন। কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ বিশ্বাস-ঘাতকতা করে আওরঙজেবের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

ভয়াবহ সংবাদ। দারা যাদের একান্ত বিশ্বাসী ভাবত একে একে তাদের মুখোস খুলে গিয়ে আসল রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। আবদুল্লা ঠিক ই বলেছিল। দারার বিশ্বস্ত সেনানায়কদের একহাতের আঙুলেই গুণে ফেলা যায়।

এবারে আমি নিজেই উপযাচক হয়ে জাহানারা বেগমের সঙ্গে দেখা করলাম। সব জানালাম তাঁকে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম তাঁর চোখে মুখে কোনরকম আগ্রহ ফুটে উঠল না। বড়ই ম্রিয়মাণ মনে হলো তাঁকে।

এই প্রথম তিনি বললেন,—কোন লাভ নেই রাণাদিল্। শত হলেও আমি নারী বৈ নই। যাকে দিয়ে কাজ করাবো সে আদৌ যোদ্ধা নয়। তার স্থান তখ্‌ত্‌তাউসের ওপর হওয়া উচিত নয়—হওয়া উচিত ইবাদৎখানায়।

বুঝলাম, আমার আগের খবরটি দারাকে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি।

—রাণাদিল্, তখ্‌ত্‌তাউসের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

—কী সেই ভাগ্য বেগমসাহেবা?

—তুমি কি বুঝতে পারনি?

মনে মনে বলি, হয়ত পেয়েছি। কিন্তু উচ্চারণ করতে আতংকিত হতে হয়। কারণ সেই ভাগ্য আমার প্রিয়তমকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে জানিনা।

—আমি বুদ্ধিমতী নই বেগমসাহেবা।

আমার জবাব শুনে জাহানারা বেগমের মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে।

তিনি বলেন,—তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। কিন্তু তুমি বুঝতে চাওনা রাণাদিল্। কোন লাভ নেই। দারা অন্তত তখ্‌ত্‌তাউসে বসবে না। সুজা, আওরঙজেব আর মুরাদের মধ্যে একজন এর ভাবী দখলদার। আমি ভাবছি বৃদ্ধ শাহানশাহ্‌র কি হবে। ওরা কি তাঁকে বাঁচতে দেবে না?

—কিন্তু একবার তিনি রুখে দাঁড়াতে পারেন না বাদশাহ্‌-বেগম? তিনি

যদি একবার জোর গলায় বলেন, এখনো তিনি জীবিত, তাহলে সব কিছু অন্য-রকম হতে পারে।

—তিনি শয্যাশায়ী। কাল দুপুর থেকে একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়েছেন। কয়েকদিন ধরে বার বার তিনি দারাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে আসেনি। দেখা করেনি শাহানশাহ্‌র সংগে। এতে তিনি ভগ্নহৃদয়।

সমস্ত লজ্জা যেন আমার। বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানের মনের কথা ভেবে কান্না পায়। অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকি।

আকাশে গাঢ় মেঘ জমেছে। ঘন ঘন বজ্রের শব্দ। বৃষ্টি পড়বে। কখন শুরু হবে ঠিক নেই।

হারেম হতশ্রী। হতশ্রীই বা বলি কেমন করে? রোশেনারার কক্ষে আনন্দের জোয়ার। আওরঙজেব এগিয়ে আসছে। আগ্রা থেকে আর বেশী দূরে নয় সে। কখন যে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। প্রতিরোধের শেষ ব্যূহের ওপর এখন প্রচণ্ডতম চাপ পড়েছে।

জাহানারা বেগম তাঁর সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করে শয্যাশায়ী শাহানশাহ্‌র পাশে অধিকাংশ সময় স্থাণুর মত বসে রয়েছেন। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎও করছেন না। আমার সঙ্গেও নয়। ফতেমা এসে বলে গেল, তিনি নাকি প্রতিদিন একটি পায়রার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন উদ্‌গ্রীব হয়ে। পায়রা খবর আনবে যুদ্ধরত বুন্দেলরাজের কাছ থেকে।

বৃষ্টি সুরু হয়েছে প্রবল ভাবে। রাত হয়ে যায় অনেক। দারা নাকি নিজে কাল আবার যুদ্ধযাত্রা করবে। সে ফিরে এসে শাহানশাহ্‌র দর্শনার্থী হয়েছিল। শাহানশাহ্‌ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, দারার স্থান রাজধানীতে নয়—যুদ্ধক্ষেত্রে।

ফতেমাকে বিদায় দিয়ে আমি পালংকে গিয়ে বসি। চিরাগবাতি বাইরের আর্দ্র হাওয়ায় মাঝে মাঝে নিভু নিভু হয়।

সেই সময় দারা এসে প্রবেশ করল। ঠিক চোরের মত। চির-উন্নত মস্তক কিছুটা নুইয়ে পড়েছে।

আমার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতে কোনরকম আওয়াজ বার হয়েছিল বোধহয়।

—তুমি কি খুবই বিস্মিত হয়েছ রাণাদিল্‌?

—না বাদশাহ্‌জাদা।

—আমি জানি তুমি অবাক হয়েছ। অনেকদিন আসিনি।

—ব্যস্ত ছিলে। সময় পাওনি।

—হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত। হয়ত শেষবারের মত এলাম তোমার কাছে।

—ওকথা বোলোনা দারা।

—আমি ভুল করেছি রাণাদিল্। সারা জীবন শুধু ভুলই করেছি।

—ভুল কে না করে বাদশাহ্‌জাদা? সময়ে শুধরে নেয়।

—হ্যাঁ। কিন্তু সময়ে আমি শুধরে নিতে পারিনি। এখন আর সময় নেই।

—নাদিরা বেগম তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে না তো?

—আমাকে চলে যেতে বলছ রাণাদিল্?

—ছি ছি তোমার প্রতীক্ষায় আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটে।

—তুমি বড় বেশী সম্মানের সংগে কথা বলছ রাণাদিল্।

জবাব দিতে পারি না।

—জানি, তোমার প্রতি বড় বেশী রূঢ় হয়েছি। কিন্তু তুমি তো আমার সব জান। আমার মুখের কথাকে শেষে তুমিও এতটা প্রাধান্য দিলে?

—না কিন্তু বড় ভয় হয়।

—ভয়? আমাকে? রাণাদিল্, যমুনার সেই প্রথম রাতের কথা কি ভুলে গেলে?

—ভুলিনি দারা। ওই স্মৃতি আমাকে চিরকাল সুখ দেয়।

—আমাকেও।

বাইরে বোধহয় বৃষ্টির সংগে ঝড়ও বেড়ে উঠেছে। কারণ পর্দাগুলো উন্মত্তের মত দুলছে।

—রাণাদিল্, যদি কখনো আমাকে পালাতে হয় তবে নাদিরাকেই শুধু সংগে নেব।

—আমি?

—তুমি এখানেই থাকবে।

—কার আশ্রয়ে?

—জানিনা। তবে এটুকু জানি তুমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে সক্ষম। নাদিরার পক্ষে সেটা অসম্ভব।

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। জানিনা কেন তার এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা প্রশ্ন করতে প্রাণে বাজে।

—রাণাদিল্।

—দারা।

—একটা কথা মনে রেখো, তুমি আর নাদিরার মধ্যে কে আমার হৃদয়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত আমি নিজেই জানি না।

—তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না দারা। বরং কিভাবে শত্রুকে পরাস্ত করা যায় সেই কথা ভাবো। তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার রাণাদিল্ নিজের পথ নিজে দেখে নিতে পারবে।

কথা কয়টি উচ্চারণ করতে আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। অশ্রু সমস্ত বাঁধ ভেঙে উপচে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তবু আমি অত্যন্ত সহজভাবে বলতে পারলাম। কেন যে শুধু নাদিরা তার সংগিনী হবে বলতে পারি না। অসহায় বলেই হয়ত দারার এই অনুকম্পা। কিংবা এই ভয়াবহ ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বে এমন দিন যদি আসে যে দারার সব পুত্রই নিহত নাদিরা তাহলে তাকে আর একটি পুত্র সন্তান উপহার দেবার ঐশ্বর্যে সম্ভাবনাময়ী। আমি নই। আমার গর্ভ অনুর্বর। কিংবা—কিংবা আমার গর্ভ অভিজাতের গর্ভ নয়। কুলহীন, গোত্রহীন, এক নর্তকীর গর্ভ বাদশাহ্‌র গুণাবলী সমন্বিত সন্তান উপহার দেবার যোগ্য নয়।

—কী ভাবছ রাণাদিল্?

—ভাবছি—জানি না। কোন ভাবনাই সংগতিপূর্ণ নয়।

—জানি। আমি এখন চলি রাণাদিল্। আমার উচ্ছ্বাস আমার আবেগ—সব কিছু চাপা পড়ে গিয়েছে।

দারাকে দ্বার অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসি। এবারে আমাকে দ্রুত সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। মতলব খাঁয়ের মারফৎ আবদুল্লার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রথম কাজ। তারপর—

তারপর কি করব জানি না। ভবিষ্যতের সেই দিনগুলি বড়ই অনিশ্চিত। আমি লিখতে জানি না। মুঘল বংশে তো আমার জন্ম নয়। জন্ম হলে নিশ্চয় কিছুটা লিখতে পারতাম। এরা পারে। বিধাতা এই বংশে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সেই প্রতিভা দিয়েছেন। জাহানারা বেগম প্রতিদিন কি যেন লেখেন—কখনো দুপুরে কখনো গভীর রাতে। যারা লেখে না, ইচ্ছে করলে তারাও লিখতে পারে। তবু লেখে না। কারণ দেহের তীব্র কামনা আর ভোগলিপ্সা ক্ষুধা তাদের লিখতে বসার ধৈর্যকে বিনষ্ট করে দেয়। নইলে রোশেনারাও কি পারত না? নিশ্চয়ই পারত।

আমি সুন্দর ভংগিতে আকর্ষণীয় ভাবে বলতে পারি না। গুছিয়ে বলার ধৈর্য আর সামর্থ আমার নেই। আমার চরণ যুগল এককালে যেমন চঞ্চল ছিল, মন এখনো তেমনি রয়েছে। মন যদি অচঞ্চল হত, তাহলে এমন খাপছাড়া ভাবে আমার কাহিনী তোমাদের শোনাতে যেতাম না। আরও চমৎকারভাবে বলতে পারতাম। হয়ত তাহলে আমার জন্যে তোমাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক হত।

আমার জন্যে না হোক দারার জন্যে অন্তত ব্যথিত হতে পারত তোমাদের হৃদয়। দারার দোষগুণ কিছু গোপন না করে আমি আস্ত বাদশাহ্‌জাদাকে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি। অন্য কেউ হলে এমন করত না। তারা অনেক চতুর অনেক কৌশলী। দোষ দুর্বলতার দিকটা তারা চেপে যায়। তারা আজ আমার বদলে আমার কাহিনী শোনালে তোমাদের চোখ এতক্ষণে আরও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে দুফোঁটা ঝরে পড়ত তোমাদের কোলের ওপর।

আমার দুর্ভাগ্য। আমার জীবনটাই তাই। তোমাদের দোষ নেই। এ নতুন কিছু নয়।

নির্জন কুটিরে পালিয়ে এলাম হারেম থেকে সেই রাতে। কোন্ রাতে? অতটা বলতে পারব না। তোমরা বুঝে নাও। বসে রইলাম সেই কুটিরে। স্তব্ধ রাজধানীতে নগরীর সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তির ওপর তখ্‌ত্‌তাউসের রোষ বর্ষিত হতে পারে। ঘরের বাইরে বের হতে প্রচণ্ড সাহসের প্রয়োজন। আমি অতটা সাহসী নই। আমার শেষ যৌবন দেশের এই বিপর্যয়ের মুখে অতটা সাহসী হতে দিতে চায় না।

কয়েকদিন ধরে হুমায়ুনশাহ্‌র সমাধি আমাকে এত প্রবলভাবে টানছে কেন? এমন তো কখনো টানে না? কতবার আবদুল্লাকে বলতে ইচ্ছে হয়েছে,—এখানে আর একদণ্ড নয়। আমাকে তুমি নিয়ে চল হুমায়ুনশাহ্‌র সমাধিতে।

কিন্তু বলতে পারিনি শেষ পর্যন্ত। পাগল ভাববে আমাকে। আগ্রা ছেড়ে সেখানে যাওয়া পাগলামি ছাড়া কি? তবু মন চঞ্চল হয় বার বার।

ইতিহাস তোমরা জান। ইতিহাস আমি শোনাতে চাই না। আমার নিজের কথাই বলতে চাই। ইতিহাসের কথা বলতে গেলে আগ্রার অনতিদূরে সামুগড়ে আওরঙজেব ও মুরাদের বিজয়ের কথা বলতে হয়। বলতে হয় একে একে সমস্ত সেনানায়ক কিভাবে দারাকে ত্যাগ করে বিরুদ্ধ দলে যোগ দিল এবং পরমুহূর্তেই আওরঙজেবকে তুষ্ট করার জন্য সেই দারারই পশ্চাদ্ধাবন করল যার মত শুভানুধ্যায়ী তাদের কেউ ছিল না।

দারা আগ্রায় ছুটে এসেছিল। শয্যাশায়ী পিতার পাশে এসে নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিল। সে তাঁর দিকে চাইল, শিশুপুত্র যেমন ভাবে বিপদে পড়ে এসে দাঁড়ায় রক্ষা পাবার আশায়। শাহানশাহ্‌র চোখদুটো জলে ভরে উঠেছিল শুধু। তখন দারা জাহানারার দিকে চাইল। কিন্তু সেখানেও আশার হাতছানি দেখতে পেল না।

সেই প্রথম দারা সারা হিন্দুস্থানে তার বাস্তব অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করল।

সে নাদিরাকে সংগে নিয়ে আগ্রা ছাড়ল। সংগে শুধু সিপার। কারণ সুলেমান তখন যুদ্ধরত।

না। আমার সংগে দেখা করার সুযোগ পায়নি সে। সেজন্যে তোমাদের মনে যেন এতটুকু বিরক্তির উদয় না হয়। ওই পরিস্থিতিতে সবার সংগে পরিপাটিভাবে সাক্ষাৎ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কান পাতলে তখন দূরে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর উৎকট জয়োল্লাস হয়ত শোনা যেত।

জাহানারা বেগমের মুখেই শুনলাম, দারা আগ্রা ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তোমরা ভাবছ এই খবর শুনে আমি মূর্চিত হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছ আমি কেঁদে ভাসিয়েছিলাম।

না না। আমি তেমন কিছুই করিনি। আমার মস্তিষ্ক ছিল স্থির। আমি সংগে সংগে মতলব খাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বললাম,—আবদুল্লাকে এখনি ডেকে পাঠাও।

—এই হারেমে ?

—হ্যাঁ। এই হারেমেই।

—তা কি সম্ভব ?

—তুমি না হারেমের খোজাদের খবরদারী কর ? তুমি না আমাকে বহিন বলে ডাকো ? তবে সম্ভব হবে না কেন ?

মতলব মাথা নীচু করে চলে গেল।

সন্ধ্যায় আবদুল্লা এসেছিল। বহুদিন পরে আবার তাকে স্বচক্ষে দেখলাম।

আবদুল্লা আগের মতই রয়েছে। শুধু অনেক গম্ভীর হয়েছে সে। আর তার কপালে চিন্তায় কয়েকটি বাড়তি বলিরেখা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে।

—আওরঙজেব কবে এসে পৌছোবে আবদুল্লা ?

—কাল দুপুর নাগাদ।

—এত তাড়াতাড়ি ?

—হ্যাঁ। তবে জাহানারা বেগম প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেবেন না তাকে।

—তাই কি সম্ভব ? বলপ্রয়োগ করবে তো।

—বলতে পারি না।

—আমি কবে হারেম ছাড়ব ?

—তুমি হারেম ছাড়বে রাণাদিল্ ?

—আমাকে থাকতে বলছ ?

—না। আওরঙজেবের হারেমের জন্য ভোগ্য পণ্য হয়ে থাকতে বলি না।

শিউরে উঠি আমি আবদুল্লার নিরুত্তাপ মন্তব্যে। মনের মধ্যে উঁকি দেয় সেই অলীক স্বপ্ন-কাহিনী—মায়ের সংগে ব্রত উদ্‌যাপন করছি।

চেঁচিয়ে উঠি,—আমাকে এখুনি নিয়ে চল আবদুল্লা।

—সম্ভব নয়।

—কেন নয়? তুমি যেখানে থাকো, আমি কি কখনোই সেখানে থাকতে পারব না?

—না। কোন নারীর পক্ষে সেখানে থাকা উচিত নয়। আমার মত জনা তিরিশ পুরুষ থাকে শুধু সেখানে।

—তাহলে?

—রাতে আবার আমি আসব। তুমি প্রস্তুত থেকো। ইতিমধ্যে একটা আস্তানা ঠিক করে নেব। কিন্তু তোমার কষ্ট হবে না তো?

—কষ্ট?

—হ্যাঁ। ঐশ্বর্যের ছিটে ফোঁটাও সেখানে নেই। অতি সাধারণ ভাবে থাকতে হবে। নইলে নজরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

—আমার কষ্ট আমার দেহে নয় আবদুল্লা—মনে। দেহ সব কিছু সইতে পারে।

—বেশ। আমি চলি।

সে অনেকটা এগিয়ে গেলে চাপা গলায় আবার ডাকি তাকে।

—একটা অনুরোধ আবদুল্লা।

—বল রাণাদিল্।

—যুদ্ধের খবরের সাধ আমার মিটেছে। কিন্তু একটা খবরের জন্যে—

—জানি। আমার লোক রয়েছে দারাশুকোর পেছনে। তেমন খবর থাকলে নিশ্চয় পাবে।

শান্তি পাই। আমার কৃতার্থ মন আবদুল্লার পায়ে পড়তে চায়।

সে কি বুঝতে পারে আমার মনোভাব? নইলে যাবার সময় বলে গেল কেন—নর্তকী রাণাদিল্‌কে সালাম।

নগরীর সেই অজ্ঞাত অংশের কুটিরেই দিন কাটে। আবদুল্লা খবর এনে দেয়।

জাহানারা বেগম শেষ পর্যন্ত কিল্লা রক্ষা করতে পারেননি। আওরঙজেব বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানের সংগে সাক্ষাৎ করেছে। শাহানশাহ্ এখন কার্যত বন্দী।

দারার হারেমের বাকী সবাই আওরঙজেবের আগমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। নাদিরা আর আমি ছাড়া সবাই রয়েছে। আমাকে খুঁজে

বার করার জন্তে চরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা দিকে।

বাইরে উঁকি দিতেও ভয় হয়। তবে আমার পোষাক দেখে এখন আর চেনার উপায় নেই।

দারা কোথায়? আবদুল্লা এখনো সেই খবর দিতে পারেনি। মনে মনে আমার বিশ্বাস রয়েছে লাহোরে যাবে দারা। যদি স্থায়ীভাবে সেখানে থাকার উপায় নাও থাকে তবু একবার সেখানে যাবে। না গিয়ে পারবে না কিছুতেই। কারণ সেখানে রয়েছে মৈনমীরের পুণ্য সমাধি—ইহজগতে তাঁর চেয়ে বড় কেউ ছিল না দারার অন্তরে। তাছাড়া একমাত্র লাহোরের অধিবাসীরা দারাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সেখানকার একজনও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তারা আওরঙজেবকে দেখতে পারে না। আমার দৃঢ় ধারণা লাহোর-বাসীদের মন জয়ের জন্য আওরঙজেব যত প্রচেষ্টা চালাক না কেন সব ব্যর্থ হবে। শুধু এই মুহূর্তে নয়—চিরকাল। কারণ লাহোরের প্রতিটি মানুষের অন্তরে দারার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

আবদুল্লা একদিন অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আমার কাছে এল। তাকে দেখে উদ্‌ভ্রান্ত বলে মনে হয়।

—খবর পেয়েছ আবদুল্লা? তোমাকে তো আগে কখনো বিচলিত হতে দেখিনি? তবে কি—

—হ্যাঁ রাণাদিল্‌। শেষ আশা নির্মূল হলো।

—কেন? খুলে বল।

—দারাশুকো লাহোর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সুলেমান শুকোর কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন সসৈন্যে তাঁর সংগে যোগ দেবার জন্তে।

—এতে এত বিচলিত হবার কি আছে?

—হব না? সুলেমান শুকো যুদ্ধরত ছিল বলেই আওরঙজেবের সৈন্যেরা এগোতে সাহস পায়নি। সুলেমানকে তারা ভয় পায়—তারা কাঁপে। এবারে তারা নিশ্চিন্তে সুলেমানের পেছু ধাওয়া করবে। ফলে বাদশাহ্‌জাদাকেও লাহোর থেকে পালাতে হবে। পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবেন? হিন্দুস্থানে আর একটিও স্থান নেই।

—তাহলে?

—আর কিছু করার নেই। সুলেমান দারাশুকোর আদেশ মরে গেলেও অমান্য করবে না।

ঠিক দুদিন পরে যে সংবাদ এসে পৌঁছল তাতে আবদুল্লার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।

দারা লাহোর থেকে পালিয়ে আরও উত্তরে হিন্দুস্থানের সীমান্ত হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেছে।

হায় ঈশ্বর! আমি জানি দারা কার ভরসায় পাগলের মত উত্তরের দিকে ছুটছে। আর কেউ না জানুক আমি জানি সে চলেছে দাদারে—সেখানকার কিল্লায়। পথশ্রান্ত দারা কত দুঃখেই চলেছে সেখানে। হিন্দুস্থানে কেউ তাকে আশ্রয় দেবে না। সবাই বিশ্বাসঘাতক। লাহোর তাকে রক্তের বিনিময়ে আশ্রয় দিতে পারত। কিন্তু লাহোরের এত শক্তি নেই যে আওরঙজেবের বিরুদ্ধে লড়বে।

হায় নাদিরা। কখনো তুমি এত কষ্ট সহ্য করনি। তুমি কি পারবে অমানুষিক ধকল অতিক্রম করতে? তুমি কি বেঁচে রয়েছ এখনো? জানি না।

আমার মন ব্যথায় নিরাশায় আর আতংকে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। তবে আবদুল্লা আমাকে সাহায্য করেছে। সে এনে দিয়েছে সাপের বিষের বড়ি। আমি সংগে সংগে রাখি সব সময়। জানি না কখন আওরঙজেবের চরের হাতে ধরা পড়ে যাই।

দারা গিয়েছে দাদার কিল্লায় আফগান নেতা মালেক জিওয়ানের কাছে। একবার দারা তার প্রাণ রক্ষা করেছিল। আফগানরা বিশ্বাসঘাতক হয় না। মনে বল পেলাম আমি। যদি কোনরকমে দারা পারস্যের শাহ্‌র সংগে সাক্ষাৎ করতে পারে তবে হয়ত তাঁর সাহায্যে আবার ফিরে আসবে হিন্দুস্থানে। নাদিরাও ফিরবে। সবাই ফিরবে।

আমি ফিরে যাব হারেমে। তবে আবদুল্লাকে সংগে নেব এবারে। তাকে আমীর করতে হবে। সব শুনে দারা কিছুতেই প্রত্যাখান করতে পারবে না।

রাতে হুমায়ুনের সমাধির স্বপ্ন দেখলাম। সমাধি-সৌধের ভেতরে আমি প্রবেশ করি। সংগে কেউ নেই। আমি একা। অদূরে শায়িত হুমায়ুনের ওপরে প্রস্তরনির্মিত বেদী। দেখে মনে হলো, এখানে আমি আগেও এসেছি। এস্থান অদেখা নয়—অচেনা নয়।

এরপর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সমাধির দিকে। সহসা মন দ্বিধায় ভরে উঠল। কেন যাব হুমায়ুন শাহ্‌র কাছে? দারার মত তিনিও বিতাড়িত হয়েছিলেন বলে? কিংবা তাঁর মত দারাও হৃতরাজ্য ফিরে পায়—এই প্রার্থনা জানাতে?

হয়ত তাই। তবু আমার চরণযুগল দ্বিধাজড়িত। মনে মনে ভাবলাম, এর চাইতে লাহোর গিয়ে মৈনমীরের সমাধিস্থানের পাশে বসে প্রার্থনা করব।

স্বপ্নে তো লাহোর, দিল্লী আর আগ্রা দূরের স্থান নয়। স্বপ্নের বাস্তব মনের প্রতি নেয়। তাই লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়নি যেমন

অসম্ভব হয়নি হুমায়ুনের সমাধিতে উপস্থিত হওয়া।

ফিরে আসছিলাম।

সেই সময় কার ডাক কানে এলো। সর্বাংগ থরথর করে কেঁপে উঠল আমার।

—রাণাদিল্?

এ কি! এখানে ও কীভাবে আসবে? ঠিক সেই কণ্ঠস্বর, যা বহুবছর আগে একদিন রাতে শুনেছিলাম যমুনার ক্ষুদ্র তরংগে ভাসমান বজরার মধ্যে।

থেমে পড়ি। চারদিকে ভালভাবে চেয়ে দেখি। কেউ কোথাও নেই। আমার মনের ভুল? নিশ্চয় তাই। এখানে দারা আসবে কি করে? দাদার কেল্লা ছেড়ে এতক্ষণে সে পারস্যের পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে সে কোন গিরিপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে—দুপাশে সুউচ্চ পাহাড়।

আবার চলতে সুরু করি।

—রাণাদিল্ যেও না।

চিৎকার করে কেঁদে উঠি,—কোথায় তুমি? কোথা থেকে কথা বলছ? আমি যে দেখতে পাচ্ছি না। দেখা দাও। আমাকে দেখা দাও। আমি যে আর পারি না।

স্তব্ধ সমাধি স্থল।

জবাব পাইনা দারার।

—দারা, তুমি কি সত্যিই এখানে আছো? এই সমাধিতে আশ্রয় নিয়েছ শেষ পর্যন্ত? নাদিরা কোথায়? বল? আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। কেউ জানে না। কোন ভয় নেই। দারা—

আমার রোদন-ভরা কণ্ঠস্বর সমাধিসৌধের ভেতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে মাথা কুটে মরতে থাকে।

আমি নিশ্চয় সুস্থ নই। আমার মাথার গোলমাল হয়েছে। তাই দারার কথা বারবার ভেসে আসছে আমার কানে। পালিয়ে যাই—

—রাণাদিল্, শেষে তুমিও আমায় ছেড়ে গেলে? নাদিরা আর নেই। সে মৈনমীরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

লুটিয়ে পড়ি। পাথরের ওপর মাথা কুটি। আর পারি না। কিছুতেই আর পারি না। না—না—না—

সেই সময় নিদ্রা ভংগ হয়।

দেখি আবদুল্লা আমার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ডান হাত চেপে ধরে রেখেছে।

—আবদুল্লা ?

—তুমি কাঁদতে কাঁদতে কপালে আঘাত করছিলে ঘুমের মধ্যে। তাই দরজা ভেঙে এসেছি।

—আবদুল্লা, ওরা আর কেউ বেঁচে নেই।

—তেমন খবর এখনো পাইনি।

—আমি জানি—আমি জানি—আমাকে আর বলে দিতে হবে না।

আবদুল্লা কিছু বলে না। কি-ই বা বলবে ?

খবর আরও বেশ কয়েকদিন আসে না। তারপর একদিন আবদুল্লার সব কয়জন সংগী ফিরে এলো একে একে।

তোমরা তো সবাই জানো—কী ঘটেছিল। সেকথা বলে তোমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করতে চেয়ে লাভ আছে ?

দারাশুকোর কথা স্বতন্ত্র। সে বীর। কিন্তু নাদিরার কথা একবার ভাব তো ? কী কষ্ট সহ্য করতে হলো তাকে ? বেচারা দাদারে পৌছতেই পারল না। তার আগেই জীবন-দীপ নিভে গেল। তবে তার দেহাবশেষ যে মৈনমীরের সমাধিতে স্থান পেয়েছে এইটুকুই যথেষ্ট। জীবনে এর চেয়ে ভাল স্থান সে আশা করেনি। তাছাড়া লাহোরবাসীরা তাকে সম্মান দেবে। তার সমাধিতে বাতি জ্বলবে—শ্রদ্ধার ফুল ঝরবে। নাদিরা বানু বেগম যে তাদেরই ভালবাসার ধন দারাশুকোর প্রিয়তমা বেগম। কাজী মকবুল্ ছিল বলেই তার দেহ লাহোরে পৌছতে পেরেছিল। শৈশব থেকে মকবুল্ তাকে নিজের কন্যার মত দেখাশোনা করেছে।

আমার কাহিনী শুনতে বোধহয় তোমাদের আর ভাল লাগছে না। তোমাদের স্বামী, কিংবা ভাই অথবা আত্মীয়েরা আবদুল্লার নেতৃত্বে বহুদিন থেকে দারার মংগলের জন্য কাজ করে এসেছে। ঈশ্বর তাদের সুস্থ রেখেছেন একি কম লাভ ? কত বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের খবর সংগ্রহের জন্য। কত বিনিদ্র রজনী পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে পথ অতিক্রম করতে হয়েছে দারারই জন্যে। আর্থিক সাহায্য কতটুকুই বা আমি করতে পেরেছি ? আমার সামর্থ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। জাহানারা বেগমের কাছ থেকে সাহায্য না পেলে শেষ পর্যন্ত কি হত জানি না। তোমাদের পুরুষ আত্মীয়দের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। সেই হিসাবে তোমরাও আমার পরম আত্মীয়।

সব পরিশ্রম ব্যর্থ হলো বটে। কিন্তু দোষ কারও নয়। তেমন হলে এদের সাহায্যে হিন্দুস্থানের গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত।

আমি জানি তোমরা কাকে দোষ দেবে। কিন্তু সেই মানুষটাকে তোমরা

যদি আমার মত অন্তর দিয়ে চিনতে তাহলে আমার যেমন বুক ভাসছে, তোমাদেরও ভাসত।

কত বড় জ্ঞানী সে। মনটি শিশুর মত। তখ্ত্তাউসে বসার মত কঠোর কূটবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে জন্মায়নি হয়ত। কিন্তু মানুষের পরিচয় কি শুধু তখ্ত্তাউসে বসার যোগ্যতায়? আবদুল্লাকে প্রশ্ন কর, সে সব কথা বলবে দারার সম্বন্ধে। আবদুল্লা আমাকে বেগম হতে দিতে চায়নি। সে চেয়েছিল নর্তকী রাণাদিল্ নর্তকী হিসাবে অমর হয়ে থাক। আমি অমর হতে পারলাম না। নাদিরার মত বেগম হিসাবেও ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভের যোগ্যতা আমার নেই। আমি হারিয়ে যাব।

আবদুল্লা জানত আমি হারিয়ে যাব। তবু সে আমাকে প্রবল ভাবে বাধা দিতে পারেনি। কেন পারেনি? দারার জন্যে। আবদুল্লার হৃদয়ে দারার জন্যে অতি কোমল একটি স্থান আছে। বাদশাহ্জাদা নয়—মানুষ দারার জন্য। নইলে সে-ও জানত, ভালভাবেই জানত দারার দুর্বলতার কথা।

তোমরা সবাই আমার সংগিনী হয়েছ আজ। একই শকটে বসে চলেছি দূরের পথে। কত গোপনে চলেছি। আওরঙজেবের চরেরা জানতে পারলে রক্ষা নেই। তবু আবদুল্লা এই ঝুঁকি নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে এভাবে দূরের পথ অতিক্রম করা কি সহজ?

হুমায়ুনের সমাধি এখন আমার কাছে তীর্থস্থান। না না, ওভাবে চোখের জল মুছিয়ে দিতে হবে না আমার। আমি নিজেই মুছে নিতে পারব। সারা জীবন তাই মুছেছি। নবাব বাদশাহ্র ঘরে তো আমার জন্ম নয়। তাছাড়া কত মুছবে তোমরা? এই অশ্রুধারার কি শেষ আছে?

তার চেয়ে তোমরা শোনো। পরে এ সুযোগ হয়ত আর আসবে না। অলক্ষ্যে আচম্বিতে কখন আমার ওপর তখ্ত্তাউসের রোষ এসে পড়ে কেউ বলতে পারে না। তোমরা শুনে রাখো। আমি শান্তি পাবো।

আবদুল্লা যখন চরম সংবাদ আমাকে জানালো, আমি কিন্তু মূর্ছা যাইনি। আবদুল্লাকে প্রশ্ন করলেই জানতে পাবে। কখন যেন আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল। শরীর আমার অবশ হয়েছিল। হাত-পা নাড়ার কিংবা কথা বলার শক্তি ছিল না ঠিকই। তবে মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল।

আমার মনে শুধু একটা জিজ্ঞাসা প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল। আফগানরাও তবে বিশ্বাসঘাতক হয়? ওভাবে চালাকী করে এককালের রক্ষাকর্তাকে ঠাণ্ডা মাথায় আওরঙজেবের লোকের হাতে সমর্পণ করল? এ-দৃশ্য দেখার আগে

নাদিরার মৃত্যু হয়ে ভালই হয়েছে। সে বেঁচে গিয়েছে। তার মন ছিল বড়ই কোমল—ঠিক ফুলের মত। কতই না দাগা পেতে হত তাকে। সে তো রাণাদিলের মত পাষাণী নয়।

নজর বেগকে তোমরা চিনবে না। আমি কিন্তু তাকে খুব ভালভাবে চিনি। এককালে দারার সামান্য একটু কৃপা পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত। সেই নেমকহারাম শেষ পর্যন্ত বন্দী দারার ভার নিল। আর তারই ওপর আদেশ ছিল দারার ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসার। উঃ দারা! আমি এখনো উন্মাদিনী হয়ে যাইনি! তোমার শেষ পরিণতির কথা জেনেও আমি দিব্যি বেঁচে আছি। এতদিনে বেঁচে থাকলে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারতে কত কম ভালবাসি তোমায়।

তোমরা ওভাবে চেয়ে রয়েছ কেন আমার দিকে? ভাবছ, মাথার ঠিক নেই। না। কখনই নয়। আমার মাথা খারাপ হলে কে দেবে ফুল ছড়িয়ে—কে দেবে বাতি? আওরঙজেব তো চায় না কেউ ওসব করুক।

কিন্তু সফি খাঁ কে? আমি চিনি না। আবদুল্লাও চেনে না বলল। নিজের হাতে লোকটা ওই নৃশংস কাজ করতে পারল? এতটুকু হাত কাঁপল না। বিবেকে বাঁধল না? একবার ভেবে দেখল না ওই মাথা কত অমূল্য, কত পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ?

আবদুল্লা বলে সফি খাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। সে সহজেই পারে। আমি মানা করেছি। তোমরাই বল, কী লাভ? তার কি আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস হত? অমান্য করলে তার নিজের গর্দান যেত। তাই সফি খাঁকে আমি ততটা দোষ দিই না, যতটা দিই দাদার কিল্লার আফগান নেতাকে। লোকটা দারাকে আশ্রয়ের নিশ্চিত আশ্বাস দিল অথচ গোপনে খবর পাঠালো আওরঙজেবের কাছে? কিন্তু আমি একথাও জোর দিয়ে বলতে পারি যে-হাতে সফি খাঁ ওই জঘন্য কাজ করেছে, সারা জীবন সেই হাত কেঁপে কেঁপে উঠবে। তলোয়ার ধরে বীরত্ব প্রদর্শন করেও আমীর সে কখনো হতে পারবে না। তাছাড়া আওরঙজেবকে সে চেনে না।

সারা হিন্দুস্থানে রটেছে দারা কাফের। মুসলমান ধর্মে তার নাকি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। কী ঘৃণ্য মিথ্যা। একজন মানুষ যদি জ্ঞানের তৃষ্ণায় অন্য ধর্মের প্রতি কৌতূহলান্বিত হয়, সেই ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য জানার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়, তবে কি সে বিধর্মী হয়ে যায়? পৃথিবীর নানা দেশে কত ধর্ম আছে শুনি। আবদুল্লা বলে, দেশ, কাল, প্রাকৃতিক আর সামাজিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া অনুযায়ী মূলত এক এক দেশে এক একটা ধর্ম গড়ে ওঠে। সব

কিছুকে কি উড়িয়ে দেওয়া ভাল ? না, তার ভেতরের সারবস্তুটুকুর সন্ধান নেওয়া জ্ঞানপিপাসুর পক্ষে স্বাভাবিক ?

তাই বলে দারাকে কাফের বলে প্রচার করা উচিত হয়নি। এর নাম মিথ্যাচার। আমি তোমাদের হলফ করে বলতে পারি দারা কাফের ছিল না। সে ছিল খাঁটি মুসলমান।

আমার বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে, দম আটকে আসছে, তবু তোমাদের একটা কথা বলে আজ শেষ করি। তোমরা ভেবে দেখো, অমন অবস্থা আওরঙজেবের হলে তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুত কিনা।

সফি খাঁর নিষ্ঠুর তরবারি নেমে এলো দারার ওপর। তার কর্তিত মস্তক ছিটকে পড়ল ভূতলে। না, না ওভাবে আমাকে চেপে ধোরো না। আমার শরীর কাঁপছে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। তবু বলতে দাও। শেষ করতে দাও।

দারার মস্তক ভূতলে পড়ল। আর সেই মস্তক কি বলে উঠল জানো ? আবদুল্লাকে প্রশ্ন করো। না না, আমিই বলছি। সেই মস্তক বলে উঠল কালিমা-ই-সাহাদাত্।

হ্যাঁ—তাই বলল। কে বলতে পারে এই কথা ? ইসলামধর্ম রক্তের মধ্যে মিশিয়ে না নিতে পারলে, কে বলতে পারে একথা ? তোমরাই বল ? পৃথিবীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দাও। কী জবাব পাও দেখো। এর পরেও তাকে বলবে কাফের ?

না না ধরতে হবে না আমাকে। একটু সময় দাও। আমি সামলে নেব। আমি নিষ্ঠুর—আমি পিশাচী। তাই আমার হৃৎপিণ্ড থেমে যাচ্ছে না। কারণ আমি চাই না থেমে যাক্।

দারার কর্তিত মুণ্ড হুমায়ুন শাহ্‌র সমাধির পাশে অবহেলিত অবস্থায় প্রোথিত রয়েছে। কেউ সেখানে বাতি দেয় না, কেউ প্রার্থনা করে না। আমি তাই যাচ্ছি। যেতেই হবে। আমি মরলে তো চলবে না। বেঁচে থাকতে হবে আমায়। সেখানে প্রার্থনা করতে হবে, ফুল ছড়িয়ে দিতে হবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি সেখানে গিয়ে বাতি দিয়ে আসতে হবে। আওরঙজেব চায় না কেউ দারাকে সম্মান দেখাক। সে চায় মৃত দারাকে পৃথিবীর মানুষ ভুলে যাক্।

আওরঙজেব উন্মাদ। ভোলে কি কখনো কেউ ? আমি ভুলব ? লাহোরের অধিবাসীরা ভুলতে পারবে ? কখনই নয়। তাছাড়া তার কিতাব ? ওই সব কিতাব তো অমর অক্ষয়। শাহানশাহ্ শাহ্‌জাহানের তাজমহল কোনদিন

ভেঙে পড়লেও পড়তে পারে। কিন্তু তার কিতাব কীভাবে অবলুপ্ত হবে?

আমি প্রতিদিন যাব সমাধিতে। জানি না দারার দেহ ওরা কোথায় পুঁতে রেখেছে। হয়ত শৃগাল কুকুর ভক্ষণ করেছে। শকুন ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খেয়েছে। কিন্তু দারার সেই সুন্দর মুখখানা রয়েছে হুমায়ুনের সমাধির পাশটিতে। ওই মুখে কত মিষ্টি কথা উচ্চারণ করত সে, কত সোহাগের বাণী শুনিয়ে আমাকে বেহেস্ত্‌-এর আনন্দ দিয়েছে। ওই মাথায় ছিল হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। গোটা পৃথিবী খুঁজলে অমন সমৃদ্ধ মস্তিষ্ক ক'টি পাওয়া যাবে?

আমি ভুলব দারাকে? আওরঙজেব উন্মাদ ছাড়া আর কি? তাই চলেছি। আমি প্রতিদিন ওখানে যাব। আমাকে যেতেই হবে। তারপর একদিন না একদিন ধরা পড়ব নিশ্চয়। একজন রমণী প্রতিদিন সমাধিতে যায় হাতে ফুল নিয়ে—এ ঘটনা অনির্দিষ্টকাল চাপা রইবে না কখনো। ধরা আমি পড়বই।

তখন?

না, তোমাদের চোখের ওই উদ্বেগাকুল দৃষ্টি বৃথা।

আমার হাসি পাচ্ছে। ইচ্ছে করলে এখন আমি সত্যিই হাসতে পারি।

এই তো সেই অমূল্য জিনিস। ওড়নার প্রান্তে বাঁধা রয়েছে। আবদুল্লা আমায় দিয়েছে। যখের ধনের মত সব সময় সংগে সংগে রাখি।

বিষ বড়ি। কিন্তু খাওয়ার আগে আবদুল্লার ইচ্ছামত একবার আমি আবার পথের নর্তকী হব। সাধারণের নর্তকী। সেই নৃত্যই বোধহয় হবে আমার শেষ নৃত্য। পথের রাণাদিল্‌ সবার চরণস্পর্শে ধন্য পথের ধুলোর ওপরই লুটিয়ে পড়বে। সেদিন দুফোঁটা চোখের জলের প্রত্যাশী আমি হব না। আমি যে পরিচয়হীন এক নারী।